সেপ্টেম্বর ২০২৩ ■ ভাদ্র-আশ্বিন ১৪৩০

নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

শেখ হাসিনার শৈশব

তাহমিদ ইসলাম মাহি, ৬ষ্ঠ শ্রেণি, বরিশাল জিলা স্কুল, বরিশাল

সাফিয়া নূর ঈদি, দ্বিতীয় শ্রেণি, চারুপাঠ হাতেখড়ি স্কুল, মিরপুর, ঢাকা

সম্পাদকীয়

বন্ধুরা, ২৮শে সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৭তম জন্মদিন। জন্মদিনে আমরা তাঁকে জানাই গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। ১৯৪৭ সালের এই দিনে তিনি গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের বড়ো সন্তান। বাঙালি ও বাংলাদেশ নিয়ে বঙ্গবন্ধু যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে তিনি এখন কর্ণধার।

১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট সপরিবারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শাহাদতবরণ করেন। ঘাতকের দল তাঁকে হত্যা করে বাংলাদেশকে চিরকালের জন্য পিছিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি। ভাগ্যক্রমে বিদেশে অবস্থান করায় প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা। ১৯৮১ সালের ১৭ই মে সকল বাধা অতিক্রম করে তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। নিজ মাতৃভূমিতে ফিরে এসেই তিনি এ দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে সংগ্রাম শুরু করেন। নিরন্তর সংগ্রামের পথে জনগণের ভালোবাসায় তিনি ক্ষমতায় আসেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই বাংলাদেশ আজ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। তিনি আমাদের কাছে সাহস ও নেতৃত্বের প্রতীক। তাঁর ৭৭তম জন্মদিন আমাদের জন্য আনন্দের। আমরা তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করি।

২৪শে সেপ্টেম্বর 'মীনা দিবস'। শিশুদের অধিকার রক্ষায় সচেতনতা বাড়াতে ১৯৯৮ সাল থেকে মীনা দিবস পালিত হয়ে আসছে। দক্ষিণ এশিয়ার কন্যা শিশুর প্রতীক হচ্ছে মীনা। সমাজ পরিবর্তনের প্রতিনিধি। মীনা প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরপুর নয় বছরের একটি মেয়ে। সে সব ধরনের প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে লড়াই করে।

৩০শে সেপ্টেম্বর 'জাতীয় কন্যা শিশু দিবস'। কন্যা শিশুদের সুরক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠাই এই দিবসের মূল লক্ষ্য। আজকের কন্যা শিশু আগামীর মা। আর একটি শিক্ষিত মা-ই পারে একটি শিক্ষিত জাতি উপহার দিতে। মীনার মতোই স্বপ্ন দেখতে শিখুক আমাদের কন্যা শিশুরা।

ভালো থেকো বন্ধুরা। নবারুণ পড়বে আর নবারুণের সাথেই থাকবে।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
ডালিয়া ইয়াসমিন

সম্পাদক
নুসরাত জাহান

সিনিয়র সহ-সম্পাদক
শাহানা আফরোজ

সহ-সম্পাদক
মো. জামাল উদ্দিন
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

সম্পাদকীয় সহযোগী
মেজবাউল হক
মো. মাছুদ আলম
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৮
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক
ফোন : ৮৩০০৬৮৮

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

মূল্য: ২০.০০ টাকা।

মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

সূচি

নিবন্ধ

০৬ আমাদের বালকবেলার ভ্রমণ কাহিনি
ড. মোহাম্মদ হাননান

১৪ শেখ হাসিনার শৈশব/ ফরিদুর রেজা সাগর

২২ শুভ জন্মদিন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী/ ইমরান পরশ

২৫ আমি মীনার কথা বলছি/ পুলক রাহা

৩৬ নীলাকাশ ও কাশফুলের ঋতু/ নুসরাত জাহান

৪৭ কাগজের কলম/ সালাউদ্দিন রেজা

সাফল্য প্রতিবেদন

৫১ বিশ্বকাপে বাংলাদেশের প্রথম আম্পায়ার
মো. কবির হোসেন

৫২ বিশ্বের সবচেয়ে লম্বা গাছ/ শাহানা আফরোজ

৫৪ ছোটোদের ডায়াবেটিকে খাদ্য তালিকা
মো.জামাল উদ্দিন

৫৫ যুক্তিতর্ক আর প্রমাণে চ্যাম্পিয়ন
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

৫৬ বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স হিটে প্রথম/ মেজবাউল হক

৫৭ আন্তর্জাতিক হকিতে চমক/ জান্নাতে রোজী

৫৮ দশদিগন্ত/ সাদিয়া ইফফাত আঁখি

৬০ বুদ্ধিতে ধার দাও/ নাদিম মজিদ

অনুবাদ গল্প

৪০ দুষ্টু খরগোশের গল্প/ খায়রুল আলম রাজু

ছোটোদের ছড়া

৪৯ মেশকাউল জান্নাত/ মো.মুশফিকুর রহমান (মিদুল)

৫০ আনিকা বিনতে মাহবুব/ মিহির হোসেন

গল্প

০৩ টিফিন চোর/আহসান হাবীব

১৮ ছোটো হাতি আর বড়ো পিঁপড়ার গল্প/ তারিক মনজুর

২৯ উড়ন্ত এক অহংকারী ব্যাঙ/ আহমাদ স্বাধীন

৩২ কুড়িয়ে পাওয়া শালিক ছানা/ আবুল হোসেন আজাদ

৩৮ বানরের সততা/ শহীদুল ইসলাম ফকির

৪৫ টিংটুকুর লাল মাছ/ জসিম উদ্দিন জয়

কবিতাগুচ্ছ

১৩ আরিফ নজরুল/ পাপিয়া সুলতানা পান্না

২৪ মহসীন শিবলু/ বি এম. লিটন মাহ্‌মুদ

২৮ অসিত কুমার মন্ডল/ আনোয়ারুল হক নূরী

৩১ আহসানুল হক/ শাহরিয়ার শাহাদাত

৩৫ মঈনুল হক চৌধুরী/ বারী সুমন/ মোনায়েম আহমেদ

৪৩ বোরহান মাসুদ/ শাহজাহান মোহাম্মদ

৪৪ এস এম মাসুদ/ ওমর ফারুক নাজমুল

৪৯ রকিবুল ইসলাম

আঁকা ছবি

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ : তাহমিদ ইসলাম মাহি, সাফিয়া নূর ঈদি

শেষ প্রচ্ছদ : ইউসুফ হায়দার আদিব

৪২ মীর্জা মাহের আসেফ

৬২ সামিহা হোসেন উম্মি (উষা)/ ইরিনা হক

৬৩ ইমি রহমান/ রিদওয়ান হোসেন হানিফ

৬৪ সৈয়দ ফারসাদ নেয়ামুল সীন/ সাইয়ান খান

নবারুণ পত্রিকার ফেসবুক পাতায় (*Nobarun Potrika*) আপলোড পত্রিকা পড়তে পারবে। এছাড়া চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট *www.dfp.gov.bd*- এর প্রকাশনা অংশ থেকে নবারুণ ডাউনলোড করা যাবে।

গল্প

টিফিন চোর

আহসান হাবীব

রবি যখন সরকারি স্কুলে ক্লাস সেভেনে পড়ত তখন ওখানে ফ্রি টিফিন দিত। টিফিনটাও ছিল মজার একটা পেটিস আর একটা লাড্ডু। দুটোই রবির প্রিয় ছিল। অবশ্য সবসময় যে পেটিস আর লাড্ডু দিত তাও না। মাঝে মাঝে অন্য কিছুও দিত। যেমন- একটা সাগর কলা আর সিদ্ধ ডিম। তবে স্যাররা হুঁশিয়ার করে দিতেন সিদ্ধ ডিমের খোসা ক্লাসে পড়ে থাকলে কঠিন পানিশমেন্ট।

এখন বাবা-মা'র বদলির কারণে রবিরা একটা মফস্বল শহরে এসেছে। ওর বাবা-মা দুজনেই সরকারি কর্মকর্তা। এখানে একটা প্রাইভেট স্কুলে ভর্তি হয়েছে, এখানে টিফিন দেয় না। বাসা থেকে টিফিন নিয়ে যেতে হয়। এই নতুন স্কুলে বেশ ভালোই চলছিল, দুয়েকজন বন্ধুও জুটে গেল। তবে মুশকিল হচ্ছে রবি কথা কম বলে। এজন্য বাসায় বাবা-মা, বড়ো বোন সবাই বিরক্ত। মা তো বলেই বসে-

কীরে রবি ২৪ ঘণ্টা মুখ সেলাই করে বসে থাকিস। একটু কথা বললেও তো পারিস।

কী বলব? রবির প্রায় ফিসফিস করে বলে।

কী বলবি মানে? কথা বলতে আবার বিষয় লাগে নাকি? রবি কলেজে পড়ুয়া বড়ো বোন মিতু বলে ' ও দেখবে মা কিছুদিন পর কথা বলতে ভুলে যাবে। তখন নতুন করে ওকে কথা বলা শেখাতে হবে। আগে বাংলা অক্ষর শেখাতে হবে অ আ ই ঈ ...তাই না রবি? ' রবি কিছু বলে না মুখ গোজ করে থাকে। রবি অবশ্য ভাবে অন্যরকম, সবাই তাকে কথা বলতে বলে। কিন্তু সত্যি কথা বলার আসলেই কিছু খুঁজে পায় না। এইও তো সেদিন ক্লাসে সবাই বলছিল, ভারতের রকেট নাকি চাঁদে নেমেছে।

তখন রবির খুব ইচ্ছে করছিল জিজ্ঞেস করে শুধু রকেট গেছে না ওই রকেটে করে মানুষও গেছে?

কিন্তু ওটা আর জিজ্ঞেস করা হয়নি। মনে হয়েছে জিজ্ঞেস করে কী হবে!

তবে তার এই কথা না বলার কারণে একটা নতুন সমস্যার সৃষ্টি হলো যেন। সেটাই পাঠকদের সাথে শেয়ার করি বরং...

ভালোই চলছিল নতুন স্কুলে। প্রথম চার পিরিয়ড পরে টিফিন পিরিয়ড। আধঘণ্টার টিফিন টাইম। সবাই হই চই করে বাইরে চলে যায়। রবি ক্লাসে বসে বাসা থেকে আনা টিফিন খায়। মা কখনো দেন নুডুলস আর ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, কখনো সেদ্ধ ডিম আর একটা ক্লাব সেন্ডউইচ বা কখনো কেক আর কলা; এই চলছিল... কিন্তু একদিন হঠাৎ টিফিন বক্স খুলে দেখে বক্স খালি! ভিতরে টিফিন নাই। মানে কী? আরে কী আশ্চর্য তারপরের দিনও টিফিন বক্স খালি...টিফিন নাই...!! তার মানে কেউ তার টিফিন চুরি করে খাচ্ছে নিয়মিত। রবি যেহেতু কথাই বলে না। তাই কাউকে বলেওনি যে তার টিফিন নেই। কেউ খেয়ে ফেলছে।

কিন্তু সে ভেবে পাচ্ছে না। কে খেতে পারে তার টিফিন। সে তো প্রথম পিরিয়ড থেকে শেষ পিরিয়ড পর্যন্ত ক্লাসেই থাকে। ব্যাগটাও তার সাথেই থাকে। কাজেই ব্যাগের ভিতর থেকে টিফিন চুরিটা করবে কে? কখন?

এই বিষয়ে বাসায়ও সে কিছু বলে না। যেহেতু কথা বলতে ইচ্ছে করে না। কী দরকার বাসায় জানানোর। টিফিন চোর কি ধরা পড়বে? কিন্তু একদিন মা যখন বললেন-

কীরে রবি টিফিন ঠিকমতো খাচ্ছিস তো?

হুঁ

হুঁ কীরে, ঠিকমতো খাচ্ছিস তো? পরিষ্কার করে বল।

খাচ্ছি

- আজ কী টিফিন ছিল?

জানি না।

জানি না মানে?

এ্যাঁ ইয়ে ... আমার টিফিন কে যেন চুরি করে খেয়ে ফেলে।

কী বলছিস! ক'দিন ধরে এরকম হচ্ছে?

এক সপ্তাহ

বলিস কী?

তারপর মা তাকে রীতিমতো জেরা শুরু করলেন। রবির মা সরকারি কর্মকর্তা, বড়ো চাকরি করেন, তিনি খুবই প্র্যাক্টিকাল মানুষ। তিনি মুখচোরা রবিকে জিজ্ঞেস করে করে বুঝে গেলেন স্কুলের কোনো দুষ্ট ছেলে এ কাজ করেনি। তাহলে কে করে কাজটা। রবির মা আসমা হায়দার রীতিমতো গোয়েন্দার ভূমিকায় নামলেন যেন। টিফিনটা তৈরি করে টিফিন বক্স রেডি করে দেন। তারপর বুয়াকে বলেন, ওর স্কুলের ব্যাগে ঢুকিয়ে দিতে। তিনি এবার সিসি ক্যামেরা চেক করলেন। আগের বাসায় তার ল্যাপটপ চুরি হওয়ার পর তিনি সতর্ক হয়ে গেছেন। এই নতুন বাসায় এসে প্রতিরুমে সিসি ক্যামেরা লাগিয়েছেন। ব্যাস ক্যামেরার রেকর্ডিং চেক করার পরই দিব্যি জানা গেল। কাজটা বুয়াই করেছে। তাকে ধরা হলো।

বুয়া তুমি এটা কেন করতে?

(বুয়া নিরুত্তর)

বলো আমি কিছু বলব না, রাগ করব না। কারণটা আমার জানা দরকার। একটা বাচ্চার টিফিন কেন তুমি চুরি করবে? বল?

শেষমেষ বুয়া মুখ খুলল, জানাল তারও একটা ছেলে আছে রবির বয়সি সেও স্কুলে যায়। কিন্তু ওকে সে টিফিন দিতে পারে না বলে তার রাগ হচ্ছিল হিংসেও হচ্ছিল। তাই...তার ভুল হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি

না রবির মা বুয়াকে বিদায় করে দেননি তার অপকর্মে। বরং এখন তিনি দুটো টিফিন বক্স রেডি করেন। একটা রবির জন্য আর একটা বুয়ার ছেলের জন্য। রবির আর টিফিন খেতে সমস্যা হয় না।

আর কী আশ্চর্য রবি হঠাৎ করে ফরফর করে কথা বলা শুরু করেছে। তাকে থামার জন্য মাঝে মাঝে মাকে বলতে শোনা যায় 'উফ রবি মুখটা একটু বন্ধ করবি? তোর মুখটা আগে সেলাই করা ছিল সেটাই ভালো ছিল'।

হঠাৎ করে এটা কেন হলো বলা মুশকিল, মানুষ আসলেই বড়ো বিচিত্র সে প্রাণী! ❑

শিশুসাহিত্যিক

আমাদের বালকবেলার ভ্রমণ কাহিনি

ড. মোহাম্মদ হাননান

আমাদের ছোটোবেলায় আমরা যে-সব সাহিত্য পাঠ করেছি, তার মধ্যে ভ্রমণ কাহিনি খুব একটা ছিল এমনটা মনে পড়ে না। তবে স্কুলের পাঠ্যবইয়ে বিশেষ করে বাংলা সাহিত্য নামে যে 'বাংলা বই' পাঠ্য ছিল তাতে দু'একটা ভ্রমণ কাহিনির সংক্ষিপ্ত অংশ ছিল। এর মধ্যে খুব মনে পড়ে মোহাম্মদ আবদুল হাইয়ের একটি লেখা, কীভাবে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের একটি বাঙালি ছেলে ব্রজেন দাশ ইংলিশ চ্যানেল সাঁতার দিয়ে পারি দিয়েছিলেন, তার বিবরণ ছিল এতে। লেখার শেষে যে অনুশীলনী ও লেখক পরিচিতি থাকতো, তা পড়ে জানতে পেরেছিলাম, লেখাটি মোহাম্মদ আবদুল হাইয়ের 'বিলেতে সাড়ে সাতশত দিন' নামক একটি গ্রন্থ থেকে সংকলিত ছিল। হয়ত এ প্রথম কোনো ভ্রমণ কাহিনির নাম শুনলাম। বাংলা গদ্য বইয়ের এ প্রবন্ধটি আমাদের খুব আকর্ষণ করেছিল দু'কারণে; এক : ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেয়ার এ তরুণ ব্রজেন দাশের বাড়ি ছিল আমাদের সোনারং গ্রামের পাশের গ্রাম বজ্রযোগিনীতে। আমরা এজন্য খুব গৌরববোধ করতাম। দুই : মোহাম্মদ আবদুল হাইয়ের বর্ণনাটি ছিল খুব সহজ-সরল মনোমুগ্ধকর গদ্যের। তিনি এমনভাবে এটা লিখেছিলেন যে, কেউ একবার এটা পড়তে বসেছে, সে আর শেষ না করে ওখান থেকে উঠতে পারছে না। বড়ো হয়ে একখানা বিলেতে সাড়ে সাতশত দিন কিনে পড়ে তবে ক্ষান্ত হয়েছিলাম।

এখানে একটু বলে রাখি, আজকের কিশোর-তরুণদের জন্য, সেটা হলো, সে সময় ব্রিটেনের 'লন্ডন' শহরকে 'বিলেত' বলা হতো। লন্ডনের নাম ব্রিটিশ আমলের বাংলায় কেন 'বিলেত' হয়েছিল তা নিয়ে বিশেষ গবেষণা নেই। তবে 'বিলেত' হলো একটি আরবি শব্দ, আরবি 'বিলায়েত' থেকে বিলেত বা বিলাত শব্দটি এসেছে। আরবি 'বিলায়েত' অর্থ হচ্ছে কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা। আমাদের দেশে ইংরেজরা এক সময় শাসন ক্ষমতায় ছিল, তারা যারপরনাই কর্তৃত্ব কর, তো সম্ভবত সে কারণেই এদেশের মানুষ ইংল্যান্ড বা লন্ডনকে 'বিলেত' বলতো। পরে বিলাত অর্থ সমগ্র ইউরোপেই বোঝানো হতো। ইংল্যান্ড বা ইউরোপের কোনো দেশে কিছুদিন থেকে দেশে ফিরে আসলে তাদের 'বিলাত ফেরত' বলা হতো। এটা এমন প্রচলিত হয়েছিল যে একটা ডিগ্রি বা পদবির মতোই তার ব্যবহার ছিল। যেমন 'অমুক বিলাত ফেরত ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন এটি' অথবা 'তার বিয়ে হয়েছে বিলাত ফেরত এক ডাক্তারের সাথে'। প্রথম প্রথম বিলাতে যাওয়া খুব ঝুঁকিতে ছিল। বিলাত থেকে কেউ ফিরে আসলে কেউ তার সাথে মিশতে চাইত না, বিশেষ করে হিন্দু সমাজে তাকে কেউ গ্রহণ করতে পারত না, তার সাথে মেয়েদের বিয়ে দেয়া হতো না। সমাজে তাকে 'একঘরে' করে রাখা হতো। বোঝা যায়, একটা সময় এমন ছিল যে, বিলাত ভ্রমণ সুখকর ছিল না। যদিও আজকের যুগের তরুণ-যুবকরা এ তথ্যটিতে অবাক হবে, কেননা এখন তো ব্রিটেন ও ইংল্যান্ড যাওয়ার ভিসা পাওয়াই একটা কঠিন ব্যাপার।

তবে আমাদের স্কুল জীবনে ভ্রমণ কাহিনির পুরোপুরি স্বাদ আমাদের পাইয়ে দিয়েছেন সৈয়দ মুজতবা আলীর নানা দেশ সফরের উপর একটি লেখা। এটি ছিল মুজতবা আলীর 'দেশে বিদেশে' বই থেকে চয়নকৃত একটি অংশ। এ কাহিনিতে কাবুলের আবদুর রহমান একটি চরিত্র ছিল। মুজতবা আলীর বর্ণনায় আমরা তার রক্ত-গোশত সবই দেখতে পেতাম :

> 'কাবুল শহরে আমি দুটি নরদানব দেখেছি। তার একটি আবদুর রহমান– দ্বিতীয়টির কথা সময় এলে হবে।
>
> পরে ফিতে দিয়ে মেপে দেখেছিলুম-ছ'ফুট চার ইঞ্চি। উপস্থিত লক্ষ্য করলুম লম্বাই মিলিয়ে চওড়াই। দুখানা হাত হাঁটু পর্যন্ত নেমে এসে আঙুলগুলো দু'কাঁদি মর্তমান কলা হয়ে ঝুলছে। পা দুখানা ডিঙি নৌকার সাইজ। কাঁধ দেখে মনে হলো, আমার বাবুর্চি আবদুর রহমান না হয়ে সে যদি আমীর আবদুর রহমান হতো তবে অনায়াসে গোটা আফগানিস্তানের ভার বইতে পারত। এ কান ও কান জোড়া মুখ– হাঁ করলে চওড়াচওড়ি কলা গিলতে পারে। এবড়ো-থেবড়ো নাক– কপাল নেই। পাগড়ি মাথায় থাকায় আকার-প্রকার ঠাহর হলো না, তবে আন্দাজ করলুম বেবি সাইজের হ্যাটও কান অবধি পৌঁছবে।
>
> রঙ ফর্সা, তবে শীতে গ্রীষ্মে চামড়া চিরে ফেঁড়ে গিয়ে আফগানিস্তানের রিলিফ ম্যাচের চেহারা ধরেছে। দুই গাল কে যেন থাবড়া মেরে লাল করে দিয়েছে– কিন্তু কার এমন বুকের পাটা? রুজও তো মাখবার কথা নয়। পরনে শিলওয়ার, কুর্তা আর ওয়াসকিট্।
>
> চোখ দুটি দেখতে পেলুম না। সেই যে প্রথম দিন ঘরে ঢুকে কার্পেটের দিকে নজর রেখে দাঁড়িয়েছিল, শেষ দিন পর্যন্ত ঐ কার্পেটের অপরূপ রূপ থেকে তাকে বড়ো একটা চোখ ফেরাতে দেখিনি। গুরুজনদের দিকে তাকাতে নেই, আফগানিস্তানেও নাকি এই ধরনের একটা সংস্কার আছে। তবে তার নয়নের ভাবের খেলা গোপনে দেখেছি। দুটো চিনেমাটির ডাবরে যেন দুটো পান্তুয়া ভেসে উঠেছে।
>
> জরিপ করে ভরসা পেলুম, ভয়ও হলো। এ লোকটা ভীমসেনের মতো রান্না তো করবেই, বিপদে-আপদে ভীমসেনেরই মতো আমার মুশকিল-আসান হয়ে থাকবে। কিন্তু প্রশ্ন, এ যদি কোনোদিন বিগড়ে যায়? তবে? কোনো একটা হদিসের সন্ধানে মগজ আতিপাতি করে খুঁজতে আরম্ভ করলুম। হঠাৎ মনে পড়ল দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথকে কুইনিন খেতে অনুরোধ করা হলে তিনি বলেছিলেন, 'কুইনিন জ্বর সারাবে বটে, কিন্তু কুইনিন সারাবে কে? কুইনিন সরাবে কে?
>
> তিনি কুইনিন খাননি। কিন্তু আমি মুসলমান-হিন্দু যা করে, তার উল্টো করতে হয়। তদ্দণ্ডেই আবদুর রহমান আমার মেজর ডোমো, শেফ্দ্য

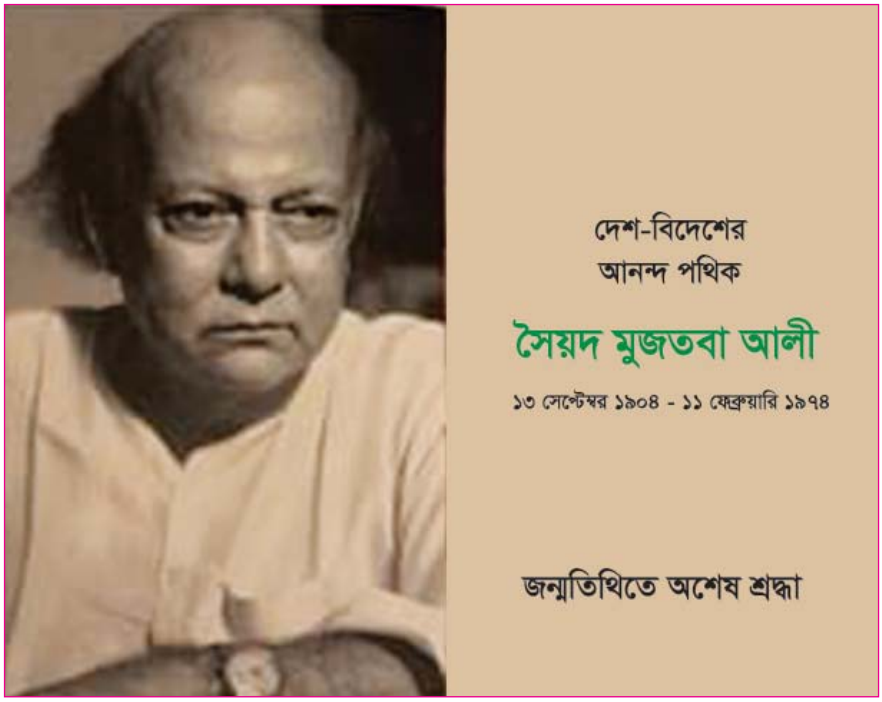

> কুইজিন, ফাই-ফরমাশ-বরদার তিনেক্কেতিন হয়ে একবারনামা পেয়ে বিড়বিড় করে যা বলল, তার অর্থ 'আমার চশম্, শির ও জান দিয়ে হুজুরকে খুশ করার চেষ্টা করব'। [সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ২০১৪, পৃষ্ঠা ৬২]।

আবদুর রহমান সম্পর্কে এরকম আরেকটি বর্ণনায় শুধু আবদুর রহমান নয়, দেশ-বিদেশের বিচার কাহিনিও অবলীলায় মনোরম বর্ণনা দ্বারা ঢুকিয়ে দিচ্ছেন মুজতবা আলী। অসাধারণ তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত, যা পাঠকমাত্রই প্রলুব্ধ হন :

> 'রাত তখন বারোটা। আবদুর রহমান বলল, 'আজ আমি আপনার বসবার ঘরে শোব'।
>
> আমি বললুম, 'তুমি তো ঠাণ্ডা ঘর না হলে ঘুমোতে পারো না। আমার প্রাণ রক্ষার জন্য তোমাকে এত দুর্ভাবনা করতে হবে না'।
>
> আবদুর রহমান বলল, 'কিন্তু আমি অন্য ঘরে শুলে আমার বিপদ-আপদের খবর আপনি পাবেন কি করে? আমার জান বাবা আপনার হাতে সঁপে দিয়ে যাননি?'

কথাটা সত্যি। আবদুর রহমান আমাদের চাকরিতে ঢুকেছে খবর পেয়ে তার বুড়া বাপ গাঁ থেকে এসে আমাকে তার জানের মালিক, স্বভাবচরিত্রের তদারকদার এবং চটে গেলে খুন করবার হক দিয়ে গিয়েছিল। আমি বুড়োকে খুশি করবার জন্য 'সিংহ ও মুষিকের' গল্প বলেছিলুম।

কিন্তু আবদুর রহমানের ফন্দিটা দেখে অবাক হলুম। সাক্ষাৎ নিউটন। এদিকে বাক্সে দুটো ফুটো করে দুটো বেড়ালের জন্য, অন্যদিকে মাধ্যাকর্ষণতত্ত্বও আবিষ্কার করতে পারে- একদিকে কর্নেলের ছেলের ধাঁধায় বোকা বনে যায়, অন্য দিকে তর্কে বাঙালিকেও কাবু করে আনে।

আবদুর রহমান শুয়ে শুয়ে 'কতলে-আম' অর্থাৎ পাইকারি খুন-খারাজি লুটতরাজের যে বর্ণনা দিল তার থেকে বুঝলুম বাচ্চায়ে সকাও যদি শহর দখল করতে পারে তবে তার কোনোটাই বাদ যাবে না। চেঙ্গিস, নাদির রাজা-বাদশা হয়ে যখন এসব করতে পেরেছেন তখন বাচ্চা ডাকাত হয়ে এসব করবে না সে আশা দিদিমার রূপকথাতেও করা যায় না।

ইরান, আফগানিস্তান, চীন প্রভৃতি সভ্য দেশে সাজা দেওয়ার নানারকম বিদগ্ধ পদ্ধতি প্রচলিত আছে। কামানের মুখে বেঁধে উড়িয়ে দেওয়া, কোমর অবধি মাটিতে পুঁজে চতুর্দিক থেকে পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে ক্ষতবিক্ষত করে মারা, পেট

কেটে চোখের সামনে নাড়িভুঁড়ি বের করে মারা, জ্যান্ত অবস্থায় চামড়া তুলে মারা ইত্যাদি বহুতর কায়দায় অনেক চাক্ষুষ বর্ণনা আমি শুনেছি। তার মধ্যে একটা হচ্ছে দেয়ালের গায়ে দাঁড় করিয়ে লম্বা পেরেক নিয়ে দু'কান দেয়ালের সঙ্গে গেঁথে দেওয়া। আবদুর রহমানের কাছ থেকে শোনা, সে অবস্থায়ও নাকি মানুষের ঘুম পায় আর মাথা বার বার ঝুলে পড়ে। তার তুলনায় রাইফেল-মেশিনগানের শব্দ, আর চেঙ্গিস নাদিরের কাহিনী স্মরণ ধূলি পরিমাণ। কাজেই সেই অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়াটা বীর অথবা কাপুরুষ কোনো কিছুরই লক্ষণ নয়'। [সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪০]।

ছোটোবেলায় ভ্রমণ কাহিনির নানা দিগন্ত আমাদের কাছে সেভাবে পৌঁছেনি। এখন যদি তুলনা করি, তাহলে দেখি যে রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণ কাহিনি অনেকটা এমনি ছিল। রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া ভ্রমণে গিয়েছিলেন, সেখানে গিয়ে তিনি রাশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থাপনাটাই বেশি পছন্দ করলেন। একটা ভ্রমণ কাহিনি পড়ে পাঠক একটা দেশ, একটা জাতি সম্পর্কেই শুধু জানতে পারছেন না, সে দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সভ্যতার নানাদিকও উঠে আসছে রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণ বৃত্তান্তে :

১. ...রাশিয়ার অবশেষে আসা গেল। যা দেখছি আশ্চর্য ঠেকছে। অন্য কোনো দেশের মতোই নয়। একেবারে মূলে প্রভেদ। আগাগোড়া সকল মানুষকেই এরা সমান করে জাগিয়ে তুলছে।...

২. ...যখন শুনলুম, রাশিয়াতে জনসাধারণের শিক্ষা প্রায় শূন্য অঙ্ক থেকে প্রভূত পরিমাণে বেড়ে গেছে, তখন মনে মনে ঠিক করলুম, ভাঙা শরীর আরও যদি ভাঙে তো ভাঙুক, ওখানে যেতেই হবে। এরা জেনেছে, অশক্তিকে শক্তি দেবার একটিমাত্র উপায় শিক্ষা-অন্ন স্বাস্থ্য শান্তি সমস্তই এরই 'পরে নির্ভর করে। ফাঁকা 'ল অ্যান্ড অর্ডার' নিয়ে না ভরে পেট, না ভরে মন। অথচ তার দাম দিতে গিয়ে সর্বস্ব বিকিয়ে গেল।

৩. ...যখন শুনেছিলুম, এখানে চাষি ও কর্মীদের মধ্যে শিক্ষা হু হু করে এগিয়ে চলেছে আমি ভেবেছিলুম, সে শিক্ষা বুঝি সামান্য একটুখানি পড়া ও লেখা ও অঙ্ক করা-কেবলমাত্র মাথা-গুনতিতেই তার গৌরব। সেও কম কথা নয়। আমাদের দেশে তাই হলেই রাজাকে আশীর্বাদ করে বাড়ি চলে যেতুম। কিন্তু এখানে দেখলুম, বেশ পাকা রকমের শিক্ষা, মানুষ করে তোলবার উপযুক্ত, নোট মুখস্থ করে এম.এ পাস করবার মতন নয়।

৪. ...রাশিয়ায় গিয়েছিলুম ওদের শিক্ষাবিধি দেখবার জন্য। দেখে খুবই বিস্মিত হয়েছি। আট বছরের মধ্যে শিক্ষার জোরে সমস্ত দেশের লোকের মনের চেহারা বদলে দিয়েছে।

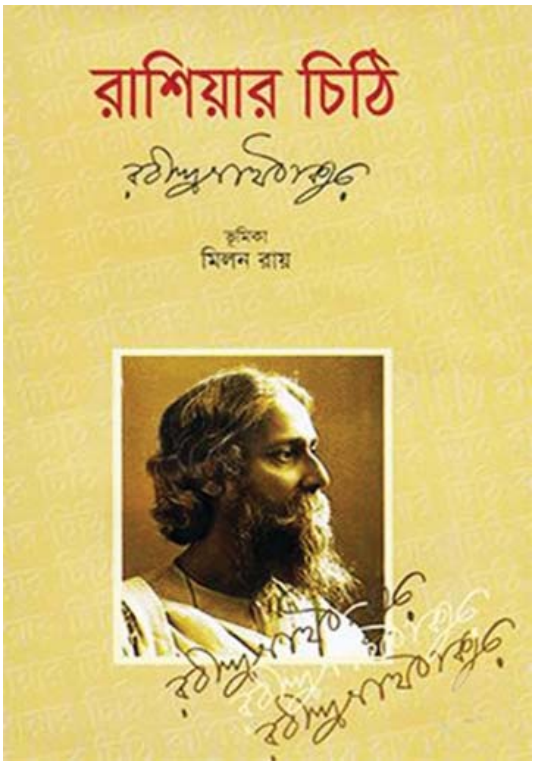

৫. ...এরা তিনটে জিনিস নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত আছে। শিক্ষা, কৃষি এবং যন্ত্র। এই তিন পথ দিয়ে এরা সমস্ত জাতি মিলে চিত্ত, অন্ন এবং কর্মশক্তিকে সম্পূর্ণতা দেবার সাধনা করছে। আমাদের দেশের মতোই এখানকার মানুষ কৃষিজীবী। কিন্তু আমাদের দেশের কৃষক এক দিকে মূঢ়, আর-এক দিকে অক্ষম; শিক্ষা এবং শক্তি দুই থেকেই বঞ্চিত।

৬. ...১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে এখানে যে বিপ্লব হয়ে গেল তার আগে এ দেশে শতকরা নিরানব্বই জন চাষি আধুনিক হলযন্ত্র চক্ষেও দেখে নি।

তারা সেদিন আমাদেরই চাষিদের মতো সম্পূর্ণ দুর্বলরাম ছিল, নিরন্ন, নিঃসহায়, নির্বাক। আজ দেখতে দেখতে এদের খেতে হাজার হাজার হলযন্ত্র নেমেছে।

...কিন্তু শুধু যন্ত্রে কোনো কাজ হয় না যন্ত্রী যদি মানুষ না হয়ে ওঠে। এদের খেতের কৃষি মনের কৃষির সঙ্গে সঙ্গে এগোচ্ছে। এখানকার শিক্ষার কাজ সজীব প্রণালীতে। আমি বরাবর বলে এসেছি শিক্ষাকে জীবনযাত্রার সঙ্গে মিলিয়ে চালানো উচিত। তার থেকে অবচ্ছিন্ন করে নিয়ে ওটা ভাণ্ডারের সামগ্রী হয়, পাকযন্ত্রের খাদ্য হয় না।

এখানে এসে দেখলুম, এরা শিক্ষাটাকে প্রাণবান করে তুলেছে। তার কারণ এরা সংসারের সীমা থেকে ইস্কুলের সীমাকে সরিয়ে রাখে নি। এরা পাস করবার কিংবা পণ্ডিত করবার জন্য শেখায় না। সর্বতোভাবে মানুষ করবার জন্য শেখায়। আমাদের দেশে বিদ্যালয় আছে, কিন্তু বিদ্যার চেয়ে বুদ্ধি বড়ো, সংবাদের চেয়ে শক্তি বড়ো, পুঁতির পঙ্‌ক্তির বোঝার ভারে চিত্তকে চালনা করবার ক্ষমতা আমাদের থাকে না।

৭. ... এখানকার বিদ্যালয়ের মস্ত একটা গুণ, এরা যা পড়ে, তার সঙ্গে সঙ্গে ছবি আঁকে। তাতে পড়ার বিষয় মনে চিত্রিত হয়ে ওঠে, ছবির হাত পেকে যায়-আর পড়ার সঙ্গে রূপসৃষ্ট করার আনন্দ মিলিত হয়।

৮. ...আমি নিজের চোখে না দেখলে কোনোমতেই বিশ্বাস করতে পারতুম না যে, অশিক্ষা ও অবমাননার নিম্নতর তল থেকে আজ কেবলমাত্র দশ বছরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে এরা শুধু ক খ গ ঘ শেখায়নি, মনুষত্বে সম্মানিত করেছে। শুধু নিজের জাতকে নয়, অন্য জাতের জন্য এদের সমান চেষ্টা।

৯. ...পার্কের মধ্যে একটা স্বতন্ত্র জায়গা কেবল ছোটো ছেলেদের জন্য, সেখানে বয়স্ক লোকদের প্রবেশ নিষেধ, সেখানকার প্রবেশদ্বারের লেখা আছে 'ছেলেদের উৎপাত কোরো না'। এইখানে ছেলেদের যতরকম খেলনা, খেলা, ছেলেদের থিয়েটার-সে থিয়েটারের ছেলেরাই চালক, ছেলেরাই অভিনেতা। [সূত্র : রবীন্দ্রসমগ্র, খণ্ড ১০, পাঠক সমাবেশ সংস্করণ, ঢাকা, ২০১১, পৃষ্ঠা ৫৫৫, ৫৬১, ৫৭৪, ৫৮২, ৫৮৯]।

উদ্ধৃতিগুলো অনেক বড়ো হয়ে গেল, প্রকৃতপক্ষে একটা ভ্রমণ কাহিনি যে একটা পুরো দেশকে তুলে ধরতে পারে, এটা হলো তার একটি উৎকৃষ্ট নমুনা। রবীন্দ্রনাথের এসব ভ্রমণ কাহিনি আমাদের বালকবেলায় পড়ার সুযোগ হয়নি। কারণ রবীন্দ্র রচনাবলি কিনে পড়া আমাদের জন্য ছিল একটি অবাস্তব চিন্তা। আমাদের স্কুলের লাইব্রেরিতে কলকাতার বিশ্বভারতী প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলি একটি সেট ছিল। কিন্তু স্কুলের বইয়ের আলমারিগুলো সবসময় তালা দেয়াই থাকতো। কোনো ছাত্র তো দূরের কথা, কোনো শিক্ষককেও আমি কখনো এসব আলমারি খুলে বইগুলো পড়তে দেখিনি। আমাদের স্কুলের দপ্তরি চাচা নাসের, যিনি ঘণ্টা বাজাতেন, তার কাছে থাকত এসব আলমারির চাবি। আমি আলমারির গ্লাসের দরজার বাইরে থেকে কাঁচের আলমারিটা হাত দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতাম আর বইগুলো শুধু দেখতাম, খুলে দেয়ার কথা সাহসে কুলাত না।

সৈয়দ মুজতবা আলী তো রবীন্দ্রনাথেরই ছাত্র ছিলেন। তাই ভ্রমণ সাহিত্য রচনায় তিনি যে রবীন্দ্রনাথকেই অনুসরণ করবেন, সে তো বলাইবাহুল্য। আমি এ জীবনে হলফ করে বলতে পারি, আমি যদি সৈয়দ মুজতবা আলীর ভ্রমণ কাহিনিগুলো পড়ার পর আর কোনো লেখকের ভ্রমণ কাহিনি বাকি জীবনে নাও পড়তাম, তাহলেও এমন কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি হতো না। সৈয়দ মুজতবা আলীর ভ্রমণ কাহিনি অন্য সকলের ভ্রমণ কাহিনির মধ্যে ছিল দ্বিতীয় রহিত। কেন এটা বললাম, আমাদের এ বেলায় এসে যেসব ভ্রমণ কাহিনি দেখছি, তার তুলনায় আমাদের কৈশোরে যেসব ভ্রমণ কাহিনি রচিত হয়েছে, সেসবের বৈশিষ্ট্যগুলোই ছিল আলাদা।

আমাদের বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগেও ভ্রমণ কাহিনি রচিত হয়েছে তবে তা পদ্যে। মনসামঙ্গলকাব্য নামে যে নানা কবিতা রচিত হয়েছিল মধ্যযুগে, তা ছিল মূলত চাঁদ সদাগরের ভ্রমণ কাহিনি। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত, নরহতি চক্রবর্তীর নবদ্বীপ পরিক্রমা ইত্যাদি হয়ত বাংলা ভ্রমণ কাহিনির ইতিহাসকে প্রাচীনত্ব দিয়েছে। কিন্তু এগুলো ধর্মীয় আবেগে পূর্ণ কতকগুলো কথিকামাত্র। ধর্মীয় প্রেরণায় মানুষ ভ্রমণ আজো করে থাকে। দুনিয়ার তাবৎ মুসলমানরা মক্কা-মদিনায় সারাবছরই ভ্রমণ করে থাকে। তাবলিগ

জামায়াতের লোকেরাও এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে, একদেশ থেকে আরেক দেশে ধর্মীয় কাজে সফর বা ভ্রমণ করে থাকে। পবিত্র কোরানেও আল্লাহতায়ালা তার সৃষ্টির সৌন্দর্য দেখতে দেশ থেকে দেশে মানুষকে ভ্রমণ করার তাগিদ দিয়েছেন। আবার অনেকে সমাজ ও পরিবার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতেও ভ্রমণ করে থাকে। তবে সবাই ভ্রমণ কাহিনি লিখেন না। আমাদের দেশে মধ্যযুগে তুরস্ক থেকে এসেছিলেন ইবনে বতুতা, চীন থেকে হিউয়েন সাং, দূরপ্রাচ্য থেকে এসেছিলেন আল বেরুনি। তাঁরা যেসব ভ্রমণ কাহিনি লিখে গেছেন তা আমাদের জাতীয় ইতিহাসকে মহিমান্বিত করে রেখেছে। ভ্রমণ কাহিনি কেউ লেখেন ডায়েরির মতো : 'আজ এখানে গেলাম, এটা দেখলাম, ওটা খেলাম' ইত্যাদি। কেউ পত্রের মাধ্যমে অন্যকে জানাতে ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখেছেন, কেউ কেউ প্রবাস জীবনে থেকে স্মৃতিকথা লিখেছেন। কিন্তু ভ্রমণ কাহিনিকে রসাশ্রিত করে সাহিত্যমণ্ডিত করার ক্ষেত্রে সৈয়দ মুজতবা আলীর জুড়ি এখনো নেই।

আমাদের বালকবেলায় সৈয়দ মুজতবা আলীর সাথে তুলনা হতে পারতো যাযাবরের। যাযাবর নামটি ছিল একটি ছদ্মনাম। বড়োবেলায় অনেক ঘাটাঘাটি করেও যাযাবরের আসল নাম খুঁজে পাইনি। কলকাতা থেকে যে সংসদ চরিতাভিধান প্রকাশিত হয়েছে তাতে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র লেখক-কবিদের নাম থাকলেও যাযাবরের নাম নেই। অনেক পরে জেনেছিলাম যাযাবর হচ্ছেন বিনয় কুমার মুখোপাধ্যায়। তিনি জন্মেছিলেন ১৯০৯ সালে আমাদের বিক্রমপুরে। কেউ কেউ সালটি ১৯১২ বলে উল্লেখ করেছেন। পিতার কর্মক্ষেত্র চাঁদপুরে তিনি বেড়ে উঠেছিলেন। যাযাবরের লেখা ভ্রমণ কাহিনি দৃষ্টিপাত পড়েনি, এমন কিশোর-তরুণ সে আমাদের প্রত্যুষবেলায় আমি বিশেষ দেখিনি। দৃষ্টিপাত ভ্রমণ বৃত্তান্তে এত সুন্দর সুন্দর কথা আছে যে তা নোট করতে করতে ডায়েরি ভরে উঠতো। সামান্য উদ্ধৃতি দেয়ার লোভ সামলাতে পারছি না :

১. 'মেয়েদের চুল ও ছেলেদের দাড়ি দুয়ের সমান প্রসাধন প্রয়োজন।... তফাৎ শুধু এই যে প্রথমটিতে যত্ন বৃদ্ধিতে, দ্বিতীয়টির বিনাশে। চুল রোজ বাঁধতে হয়, দাড়ি কামাতে হয়। যে রাঁধে, সে চুলও বাঁধে এবং যে আপিস করে, সে ক্ষুরও চালায়-একথা সত্য। [পৃষ্ঠা ৯]।

২. ভারতবর্ষে ইংরেজদের নির্লজ্জ উচ্ছৃঙ্খলতার প্রধান কারণ এই যে, চারপাশে দর্শকদের ওরা মানুষ বলেই গণ্য করে না। [পৃষ্ঠা ১৬]।

৩. এ দেশে বিদ্যা, বুদ্ধি এবং কর্মকুশলতার মাপকাঠি দাঁড়িয়েছে ইংরেজি বলা ও লেখার কৃতিত্বে। [পৃষ্ঠা ২৬]।

৪. ভারতবর্ষে ইউরোপীয় ভাবধারার প্রথম উন্মেষ ঘটলো বাংলাদেশে। ইংরেজি শিক্ষা ও সভ্যতাকে প্রথম বরণ করলো বাঙালি। [পৃষ্ঠা ৪২]।

৫. কলকাতার লালদীঘির জল সাদা এবং গোলদীঘির আকার চতুষ্কোণ। [পৃষ্ঠা ৪৩]।

৬. ভারতীয় সাংবাদিকদের, বিশেষ করে রিপোর্টারদের বুদ্ধি আছে, শক্তি আছে, কৃতিত্বও কম নয়। কিন্তু

তাঁদের ক্ষেত্রবোধ নেই। তারা যে রাজনীতিক নন, এ কথাটা তাঁরা কদাচিৎ স্মরণ রাখেন। ...এদেশের সাংবাদিকেরা শুধু প্রথম শ্রেণির রিপোর্টার হয়েই খুশি থাকতে চান না, প্রথম শ্রেণির পলিটিশিয়ানও হতে চান। [পৃষ্ঠা ৪৯]।

৭. এখানে যে ডাক্তার জ্বরের চিকিৎসা করেন, তিনি ফোঁড়াও কাটেন এবং দরকার হলে দাঁতও তোলেন। [পৃষ্ঠা ৪৯]।

যাযাবরের দৃষ্টিপাত আমাদের সেই ছোটোবেলায় ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য এবং ভ্রমণ কাহিনির তৃষ্ণা একসাথে মিটিয়েছিল। তাঁর গ্রন্থের অনেক মন্তব্য পরবর্তীকালে 'প্রবাদবাক্য'তে পরিণত হয়।

'দিল্লি অনেক দূর' বাক্যটি বিভিন্ন সময় নানা কারণে সমাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, এটা যাযাবরের দৃষ্টিপাত বইয়েরই একটি মন্তব্য। সে সময়ে এ বই আমাদের অন্তর্দৃষ্টিকে খুলে দিয়েছিল। তাই সে সময় আমাদের হাত থেকে হাতে দৃষ্টিপাত ঘুরে বেড়াতো।

ছোটবেলায় ভ্রমণ কাহিনি পড়াতে একটা মজা এনে দিয়েছিল আরব্য উপন্যাস। এ গ্রন্থে সিন্দাবাদ নামে এক বণিকের দেশ থেকে দেশান্তরে ভ্রমণের কিসসা লিপিবদ্ধ আছে। ঐতিহাসিকভাবে সত্যি সত্যি সিন্দাবাদ নামে কেউ ছিলেন কিনা তা নিয়ে বিশেষ গবেষণা নেই। তবে কিসসা হলেও শৈশবে আমরা সাগর, মহাসাগর, দ্বীপ-উপদ্বীপ, পাতালপুরী ইত্যাদি জায়গায় ভ্রমণ না করেই ভ্রমণের স্বাদ পেয়েছি। কী এক মায়াজালের বর্ণনায় আমরা শৈশবে সিন্দাবাদের মতো ভ্রমণবিদ হওয়ার স্বপ্ন দেখতাম।

নবম-দশম শ্রেণির ছাত্রকালে হঠাৎ একদিন দেখলাম গালিভার ট্রাভেলস নামে একটি ইংরেজি দ্রুতপঠন বা Rapid Readers পাঠ্য করে দেয়া হয়েছে। গালিভার নামক ভদ্রলোকের একটি সফরনামা বা ভ্রমণ বৃত্তান্ত এভাবে আমাদের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হলো। এটা আমাদের ইংরেজি শেখার পাশাপাশি আনন্দও দিয়েছে প্রচুর। একদিন আমাদের বন্ধু আরিফ কামাল এসে বলল, ও নাকি বরিশালে বেড়াতে গিয়ে শুনে এসেছে, আরবদের লেখা আরব্য উপন্যাসের সাথে পাল্লা দিতেই নাকি ইংরেজরা এই গালিভার ট্রাভেলস লিখেছে। এ নিয়ে আমাদের মধ্যে প্রচুর বিতর্ক, আলোচনা-সমালোচনা দেখা দিল। স্কুলের নিয়মিত বিতর্ক সভায়ও একবার আমাদের শিক্ষকরা একটা বিষয় এনে হাজির করলেন, 'কোনটা অধিক রোমাঞ্চকর ভ্রমণ কাহিনি: আরব্য উপন্যাস নাকি গালিভার ট্রাভেলস। বিতর্কের শেষে যে ভোটাভুটি হতো তাতে আমি আরব্য উপন্যাস-এর পক্ষে হাত তুলেছিলাম। ❑

লেখক ও গবেষক

মুজিবের কন্যা

আরিফ নজরুল

এই দেশ এই নাও
এই নদী এই গাঁও
যদি চাও শীর্ষে
তার হাতে বাঙালি
নিরাপদ নিরাপদ
অকূলের তীর সে।

নাম তাঁর হাসিনা
মুজিবের কন্যা
ভয় তিনি পান না
যত ঝড়-বন্যা।

ডিজিটাল দেশ দিলো
দিলো সুখ-শান্তি
তার ছোঁয়ায় সোনা ফলে
আগে তোরা জানতি?

জেনে নে জেনে নে
জেগে আছি আমরা
জনগণ ভালো আছে
তোরা দাঁত কামড়া।

জয় জয় হবে জয়
নৌকার নৌকার
বাঙালিরা পড়বেই
বিজয়ের মণিহার।

শুভ জন্মদিন বঙ্গকন্যা

পাপিয়া সুলতানা পান্না

তোমার হাতেই দেশ নিরাপদ তোমার হাতেই শান্তি
তোমার হাতেই দূর হয়ে যাক সকল রকম ভ্রান্তি।
তোমার চোখেই বিশ্ব জয়ের স্বপ্ন দেখি চোখে
আমরা যাব বিশ্বলোকে কে আমাদের রোখে।
মানবতার মা তুমি, আজ বিশ্ববাসী জানে
বনের পাখি মেতে ওঠে তোমারই জয়গানে।
তোমার হাতেই উন্নয়নের দিলাম তুলে চাবি
এই আমাদের ভালো রেখো এটাই শুধু দাবি।

শেখ হাসিনার শৈশব

ফরিদুর রেজা সাগর

বিখ্যাত মানুষের শৈশব কেমন ছিল, কীভাবে তারা সেইসব দিনগুলো উপভোগ করেছেন সেগুলো জানার আগ্রহ কার না থাকে। বিশ্বের বিখ্যাত ব্যক্তি যেমন- রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও বঙ্গবন্ধুর ছেলেবেলা সম্পর্কে পড়েছি। তোমরা যারা বড়ো হচ্ছো তাদের আগ্রহ সমকালীন বিখ্যাত মানুষের শৈশব জানার জন্য। আজ আমরা জানবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শৈশবের দিনগুলো কেমন ছিল। তোমরা অনেকেই জেনেছ বা পড়েছ তিনি ১৯৪৭ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন। নিভৃত পল্লি। শান্ত পরিবেশ। গ্রামের আর দশটি পরিবারের মতোই ছিল তাদের জীবনযাপন। তখন কিন্তু এই বৈদ্যুতিক বাতি ছিল না, হারিকেনের আলোয় লেখাপড়া করতে হতো। কুপি বাতিও ছিল। কুপি বাতি মানে হলো চেরাগ বাতি। যারা গ্রামে থাকো তারা এখনো হারিকেনের সাথে পরিচিত আছ। এটি কেরোসিনে জ্বলে। গ্রামের অনেকের বাড়িতে এখন হারিকেন না জ্বললেও হয়ত খাটের নিচে বা গোলাঘরে স্থান পেয়েছে এটি।

তাই তো তিনি গ্রামকে ভালোবেসে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন 'আমার জীবনের শেষ দিনগুলো আমি টুঙ্গিপাড়ায় স্থায়ীভাবে কাটাতে চাই। খুব ইচ্ছে আছে নদীর ধারে একটি ঘর তৈরি করার।'

যদিও জানা নেই সেই ঘরের স্বরুপ কেমন হবে - তবে তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে তারও কিছুটা আভাস পাওয়া যায়, সেই ঘর হবে খুব সাধারণ, থাকবে মাটির দেয়াল, বাঁশ-লতা দিয়ে মোড়ানো–ছোট্ট একটি উঠোন, সামনে বয়ে যাবে নদী। এখানে এটা উল্লেখ্য

যে, তাঁদের পূর্বপুরুষ যখন টুঙ্গিপাড়াতে জমিজমা ক্রয় করেন তখন কলকাতা থেকে কারিগর এবং মিস্ত্রী নিয়ে সেখানে দালান তৈরি করেন, যা পরবর্তীতে পাক হানাদার বাহিনী আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়। যার ধ্বংসাবশেষ এখনও কালের স্বাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর ভাষায়-

> 'এখনো কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই দালানের ধ্বংসাবশেষ। একাত্তরে যে দুটো দালানে বসতি ছিল পাকিস্তানি হানাদার আগুন দিয়ে দুটোই জ্বালিয়ে দেয়। এই দালানকোঠায় বসবাস শুরু হবার পর থেকে ধীরে ধীরে বংশ বৃদ্ধি হতে থাকে আর আশপাশে বসতির সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। এই দালানের উত্তর-পূর্ব কোণে টিনের দোচালা ঘর তোলেন আমার দাদার বাবা শেখ আব্দুল হামিদ। আমার দাদা শেখ লুৎফর রহমান এই বাড়িতেই সংসার গড়ে তোলেন। আর এখানেই জন্ম নেন আমার আব্বা ১৯২০ সালের ১৭ ই মার্চ'।

প্রধানমন্ত্রীর কাছে ছেলেবেলা ছিল অত্যন্ত মধুর, তার সবটুকুই যেন গ্রামের স্মৃতি। গ্রামের পুকুরের পানিতে ঝাঁপ দিয়ে, ধুলোমাখা মেঠোপথে ধুলো মেখে বাড়ি ফিরে বকুনি খাওয়া কিংবা কোনো কোনো সময় বাবুই আর চড়ুই পাখির বাসা তৈরির কারসাজি দেখে দিন কাটত! শৈশবে তার সমস্ত স্মৃতি জুড়েই রয়েছে গ্রামের সহজ-সরল প্রকৃতি আর পরিবেশ। আলোছায়ার খেলা। পাখিদের সাথে মিলেমিশে কাটানো শৈশব, তাদের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ যেন বারে বারে উঠে আসে তাঁর কথায়, তাঁর লেখায়। গ্রামের সহজ-সরল মানুষদের জীবন তাঁকে ভাবতে শিখাতো নিবিড়ভাবে। সেই সময় গ্রামের ঘরবাড়িগুলো ছিল সব কিছুর আঁধার। তখন দুধ, ছানা, মাখন ঘরেই তৈরি হতো। বাগানের ফল আর পুকুরের তাজা মাছ ছিল রোজকার বিষয়। গ্রামের কথা বলতে যেন এগুলোই আমাদের মনে ভেসে আসে। কাচারি ঘরের ব্যবহার ছিল তাদের জীবনযাত্রার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে। গ্রামের বড়ো বড়ো সবুজ মাঠে ঘুরে বেড়ানো আর বন্ধুদের সাথে নিয়ে খেলায় মত্ত হওয়া এ যেন জীবনের সাথে একই সুত্রে গাথা ছিল। এমনকি ফড়িঙে পেছন পেছন দৌড়ানো আর ঝরে পড়া পাতা গুলোকে কুড়িয়ে কোথাও কোনো বারান্দায় গুছিয়ে রাখার স্মৃতিগুলো ছিল বড়োই আদরের। আর এভাবেই গ্রামের সাথে নিজেকে মিলিয়ে সবুজ বাংলার গ্রামের ছবি এঁকেছেন তিনি। তাঁর আব্বার স্কুলে যাওয়া থেকে শুরু করে গ্রামের ফুটবল খেলা, সকলের সাথে মিলেমিশে থাকা, ছোটোবেলার গল্প - সবকিছুই যেন গ্রামের সাথে একাকার হয়ে রয়েছে যা তাঁর লেখার মধ্যে ফুটে ওঠে অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে।

তিনি লিখেছেন-

> 'দাদির কাছে গল্প শুনেছি যখন ছুটির সময় হতো তখন দাদি আম গাছের নিচে এসে দাঁড়াতেন। খোকা আসবে, দূর থেকে রাস্তার উপর নজর রাখতেন। একদিন দেখেন তার খোকা গায়ের চাদর জড়িয়ে হেঁটে আসছে। পরনে পায়জামা-পাঞ্জাবি নেই। কি ব্যাপার? এক গরিব ছেলেকে তার শত ছিন্ন কাপড়ে দেখে সব দিয়ে এসেছেন।'

শহরের মতো গ্রামও এখন আলোকিত হয়েছে বিদ্যুতের আলোয়। আর এই বিদ্যুতের ব্যবস্থা কিন্তু করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি তো বঙ্গবন্ধু কন্যা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ সন্তান তিনি। গ্রামের ধুলোমাটি মেখেই তিনি বেড়ে উঠেছেন। বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা

মুজিবের কোল আলো করে তিনি এলেন পৃথিবীতে। পিতা শেখ মুজিব তখন রাজনৈতিক নেতা। বাঙালির আপামর জনতার আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। মিছিল মিটিং নিয়ে ব্যস্ত সারাদিন। পরিবারকে সময় দিতে পারেন না। ছেলেমেয়েকে বুকে নিয়ে আদর করার সময়ও পান না তিনি। শৈশবে শেখ হাসিনার শিক্ষাজীবন শুরু হয় গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়ার একটি পাঠশালায়। তারপরই তাঁর পরিবারসহ তিনি ঢাকায় চলে আসেন।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য (এমপিএ) নির্বাচিত

হওয়ার পর সাত বছর বয়সে পরিবারের সঙ্গে ঢাকায় আসেন শেখ হাসিনা। পুরান ঢাকার মোগলটুলির রজনী বোস লেনে বসবাস শুরু করেন তাঁরা। পরে বঙ্গবন্ধু যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সদস্য নির্বাচিত হলে ৩ নম্বর মিন্টো রোডের সরকারি বাসভবনে ওঠেন।

১৯৫৬ সালে টিকাটুলির নারীশিক্ষা মন্দির বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি হন শেখ হাসিনা।

১৯৬১ সালের ১লা অক্টোবর ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডের বাড়িতে বসবাস শুরু করেন জাতির পিতার পরিবার। ১৯৬৫ সালে আজিমপুর বালিকা বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পাস করেন শেখ হাসিনা। ১৯৬৭ সালে ঢাকার বকশী বাজারের ইন্টারমিডিয়েট গভর্নমেন্ট গার্লস কলেজ (বর্তমান বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা মহাবিদ্যালয়) থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেন বঙ্গবন্ধু কন্যা। এই কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি কলেজ ছাত্রসংসদের সহ-সভানেত্রী (ভিপি) পদে নির্বাচিত হন। তিনি প্রথম বছর এ কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এবং পরের বছর সভাপতি ছিলেন।

একই বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে ভর্তি হন তিনি। শেখ হাসিনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের একজন সদস্য এবং ছাত্রলীগের রোকেয়া হল শাখার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ১৯৭৩ সালে শেখ হাসিনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন।

কিশোর বয়স থেকেই রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে ছাত্রলীগের নেত্রী হিসেবে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন এবং ছয় দফা আন্দোলনসহ বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ পরিবারের সদস্যদের যখন নির্মমভাবে হত্যা করা হয় তখন তিনি এবং তাঁর ছোটো বোন শেখ রেহানা বিদেশে অবস্থান করছিলেন। যার

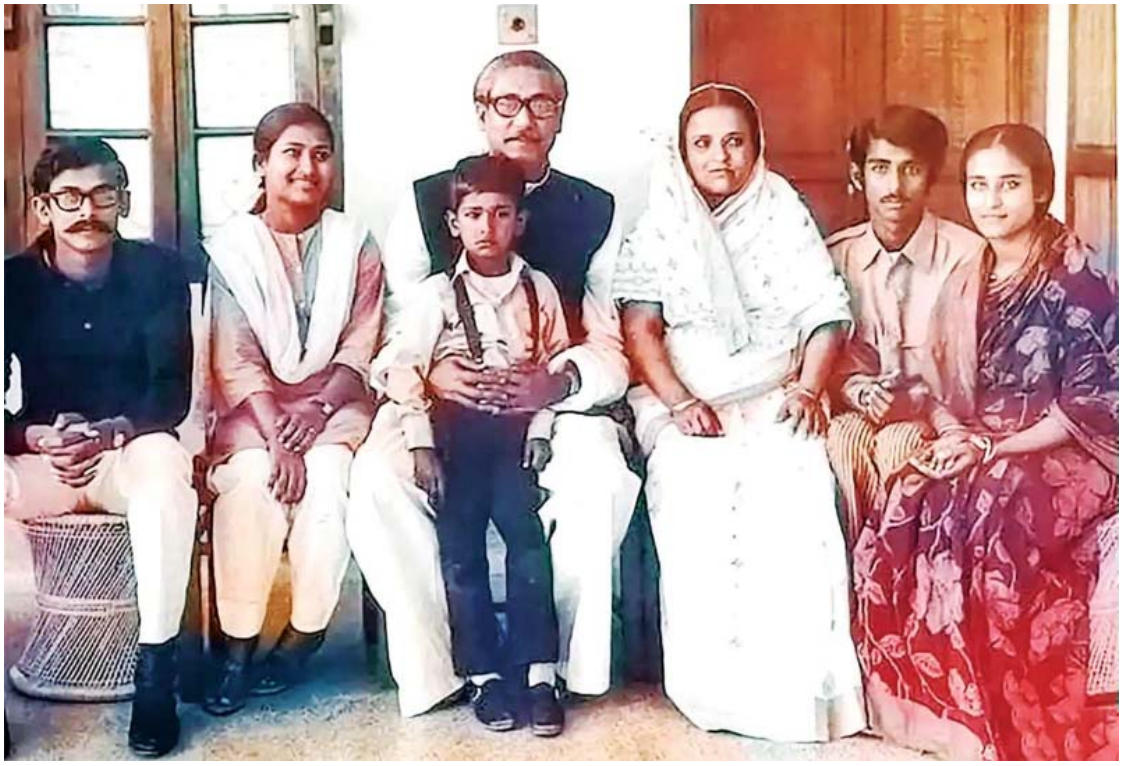

কারণে তিনি প্রাণে বেঁচে যান। এরপর ১৯৮১ সালের ১৭ই মে দেশে ফিরে এসে আওয়ামী লীগের হাল ধরেন। ১৯৯৬ সালে তিনিন প্রথম প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। তারপর আবার ২০০৮ সালের নির্বাচনে তাঁর দল ক্ষমতায় এলে পুনরায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। তার ছেলেবেলা সম্পর্কে আরও বলেন–

> 'আমরা তখন নৌকায় করে গোপালগঞ্জ থেকে ঢাকায় এসেছিলাম।
>
> ঢাকায় আমরা এলাম ১৯৫৪ সালে। আমি আর কামাল। জামাল ছিল খুব ছোটো। আর প্রথমবার আমরা এসেছিলাম ১৯৫২ সালে। তখন ভাষা আন্দোলন হয়। আব্বা ছিলেন জেলখানায়। তখন খবর পেলাম, আব্বার শরীর খুব খারাপ। তখন দাদা সিদ্ধান্ত নিলেন, আমাদের নিয়ে ঢাকা আসবেন, আমরা তখন নৌকায় করে ঢাকা এসেছিলাম। আমার দাদার বড় নৌকা ছিল। তাতে দুটি কামরা ছিল। তিন মাল্লার নৌকা। আমি আর কামাল আমরা ছোটবেলায় দৌড়াদৌড়ি করতাম নৌকার মধ্যে হাঁটতে পারতাম। নৌকার ভেতরেই রান্নাবান্না হতো। খাওয়া-দাওয়া হতো। যখন ঝড় আসত কিংবা পাশ দিয়ে স্টিমার যেত, নৌকা যে দুলত, দাদি আমাদের ধরে রাখতেন। আমার খুব মনে আছে। ঢাকায় আসতে আমাদের চার দিন লেগেছিল।'

বন্ধুরা, তোমরা বড়ো হচ্ছো। তোমাদের শৈশব রঙিন করে তোলো লেখাপড়া, খেলাধুলা, সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে। একদিন বড়ো হয়ে তোমরাই তো এদেশের বড়ো বড়ো পদে অধিষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশকে সুন্দর করে গড়ে তুলবে। আমাদের সকলের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আদর্শকে সামনে রেখে নিজেদের আগামী স্বপ্নের সোনার বাংলা বির্নিমাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। নিজেকে গড়ে তুলবে স্মার্ট নাগরিক হিসেবে। তোমাদের হাত দিয়ে এগিয়ে যাবে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দুর্বার গতিতে ছুটে চলা আজকের বাংলাদেশ। ❑

শিশুসাহিত্যিক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, চ্যানেল আই

গল্প

ছোটো হাতি আর বড়ো পিঁপড়ার গল্প

তারিক মনজুর

ছোটো হাতিটার শুঁড় সুড়সুড় করছিল। মনে হচ্ছিল, একটা পিঁপড়া শুঁড়ের উপর হাঁটাহাঁটি করছে। হাতিটা ভাবল, মানুষের মতো হাতিদের আয়না থাকলে ভালো হতো। আয়নায় দেখা যেত কে শুঁড়ের উপর হাঁটাহাঁটি করছে। তার হাঁটাহাঁটির কারণে খানিক সুড়সুড়িও লাগছে।

'শুনছ? কেউ কি আমার শুঁড়ের উপর হাঁটাহাঁটি করছ?' ছোটো হাতি জিজ্ঞেস করে।

সে ভেবেছিল কোনো উত্তর আসবে না। কিন্তু নিচু গলায় কেউ একজন বলে উঠল, 'আমি।'

'আমি কে?'

'আমি একটা বড়ো পিঁপড়া।' গলা নিচু হলেও বেশ সাহসী মনে হলো পিঁপড়াটাকে।

ছোটো হাতি তখনো পিঁপড়াটাকে দেখতে পাচ্ছিল না। কেবল তার গলা শুনতে পাচ্ছিল। গলা শুনে হাতির মনে হলো, পিঁপড়াটা হয়ত পিঁপড়াদলের সর্দার। নইলে কোনো হাতির সাথে এমন সাহস নিয়ে কথা বলতে পারত না। যত ছোটো হাতিই সে হোক, হাতিদের সাথে কথা বলতে সাহস লাগে। সে পিঁপড়াটাকে বলল, 'তুমি বলছ তুমি বড়ো পিঁপড়া। তার মানে তুমি কি পিঁপড়া-দলের সর্দার?'

'হ্যাঁ, আমি পিঁপড়া-দলের সর্দার।'

'তা, এখানে ... মানে আমার শুঁড়ে উঠলে কীভাবে?'

পিঁপড়া বলল, 'এই যে তুমি কলা গাছ খাচ্ছ, সেই কলা গাছে ছিলাম আমি। শুঁড় দিয়ে পেঁচিয়ে কলা গাছ যখন মুখে পুরতে গেলে, আমি কোনোরকমে তোমার শুঁড়ে উঠে প্রাণ বাঁচালাম।'

পিঁপড়ার কথা শুনে হাতিটা ভাঙা কলা গাছের দিকে তাকালো। আজই প্রথম সে একা একা কলা গাছ খেতে এসেছে। এতদিন মা'র সাথে আসত। আজ একা এসেছে। আসার সময় মা বলে দিয়েছে, 'তুমি এখন অনেক ছোটো। একা একা কলা গাছ খেতে যাচ্ছ, যাও। তবে দেখেশুনে কলাগাছ খাবে।'

'কেন? দেখেশুনে কলা গাছ খেতে হবে কেন?' ছোটো হাতি জিজ্ঞেস করেছিল।

মা বলেছিল, 'দেখেশুনে কলা গাছ খেতে হবে। কারণ, কলা গাছে পিঁপড়া থাকতে পারে।'

দেখেশুনেই খাচ্ছিল। তবে পিঁপড়া দেখে খাওয়ার কাজটা সহজ নয়। পিঁপড়ারা ছোটো হয়। একসঙ্গে অনেকগুলো না থাকলে ঠিকমতো দেখা যায় না। ছোটো হাতি এই পিঁপড়াটাকেও দেখতে পায়নি। যদিও পিঁপড়াটা বলছে, সে বড়ো পিঁপড়া। কিন্তু পিঁপড়া বড়ো হলেও আর কত বড়ো হবে! দেখতে পারলে বোঝা যেত কত বড়ো। কিন্তু দেখাই যাচ্ছে না। হাতিটা বলল, 'বুঝলাম তুমি বড়ো পিঁপড়া। কিন্তু কত বড়ো?'

'পিঁপড়াদের মধ্যে আমার মতো বড়ো কেউ নেই।' তারপর খানিক থেমে পিঁপড়াটা বলল, 'তবে আমি আরো বড়ো হতে চাই।'

বাচ্চা হাতি ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল, 'তুমি বড়ো হতে চাও? আমি কিন্তু ছোটোই থাকতে চাই।'

পিঁপড়া এবার জ্ঞানী জ্ঞানী ভাব নিয়ে বলল, 'ছোটো সবসময় ছোটো নয়। আর বড়ো সবসময় বড়ো নয়।'

'মানে?'

পিঁপড়া এবার ব্যাখ্যা করে, 'মানে তোমরা হাতিরা ছোটো হলেও অনেক বড়ো। আর আমরা পিঁপড়ারা বড়ো হলেও অনেক ছোটো।' বলার পরে দুঃখ দুঃখ ভাব নিয়ে বড়ো পিঁপড়া একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

ছোটো হাতি বলল, 'বুঝেছি। তুমি বড়ো হতে চাও। কিন্তু এজন্য দুঃখ করছ কেন? আমার মা বলেছে, যে যেমন হতে চায়, সে তেমন হতে পারে।'

বড়ো পিঁপড়া এবার হেসে উঠল। বলল, 'সবকিছু চাইলেই কি আর হতে পারে? এই যেমন তুমি ছোটো থাকতে চাও। কিন্তু কয়েক দিন পর দেখতে পাবে, তুমি বড়ো হয়ে গেছ।'

পিঁপড়ার কথা শুনে বাচ্চা হাতি শুঁড় নাড়িয়ে 'না না' করে উঠল। বলল, 'আমি বড়ো হতে চাই না। আমি ছোটো থাকতে চাই।'

হাতিটা শুঁড় নাড়াচাড়া করায় পিঁপড়া ভয় পেয়ে গেল। সে শুঁড়ের উপর দৌড়াদৌড়ি করতে করতে বলল, 'আরে আরে, করো কী! করো কী! এত নাড়াচাড়া করলে আমি পড়ে যাব তো!'

বাচ্চা হাতি তবু শুঁড় নাড়িয়ে বার বার বলতে থাকল, 'আমি বড়ো হতে চাই না। আমি বড়ো হতে চাই না।' বার বার শুঁড় নাড়াচাড়ায় পিঁপড়ার পড়ে যাওয়ার অবস্থা হলো। সে তাড়াতাড়ি প্রাণ বাঁচাতে হাতির শুঁড়ের ভিতর ঢুকে পড়ল। আর তখনি শুঁড় লম্বা করে ছোটো হাতি দিল একটা হ্যাঁচ্চো!

সেই হ্যাঁচ্চোতে পিঁপড়া গিয়ে পড়ল দশ ফুট দূরে। কিন্তু ওমা, এ কী! বড়ো পিঁপড়া তাকিয়ে দেখে সে হাতির মতো বড়ো হয়ে গেছে। পিঁপড়া খুশিতে লাফিয়ে উঠতে চাইল। কিন্তু এত বড়ো শরীর নিয়ে সে লাফাতে পারল না। 'আচ্ছা, আমি তো বড়ো হয়ে গেলাম। কিন্তু বাচ্চা হাতিটা গেল কোথায়?' বিড়বিড় করে সে বলার চেষ্টা করে।

কাছ থেকেই বাচ্চা হাতির গলা শোনা গেল, 'এই যে আমি!'

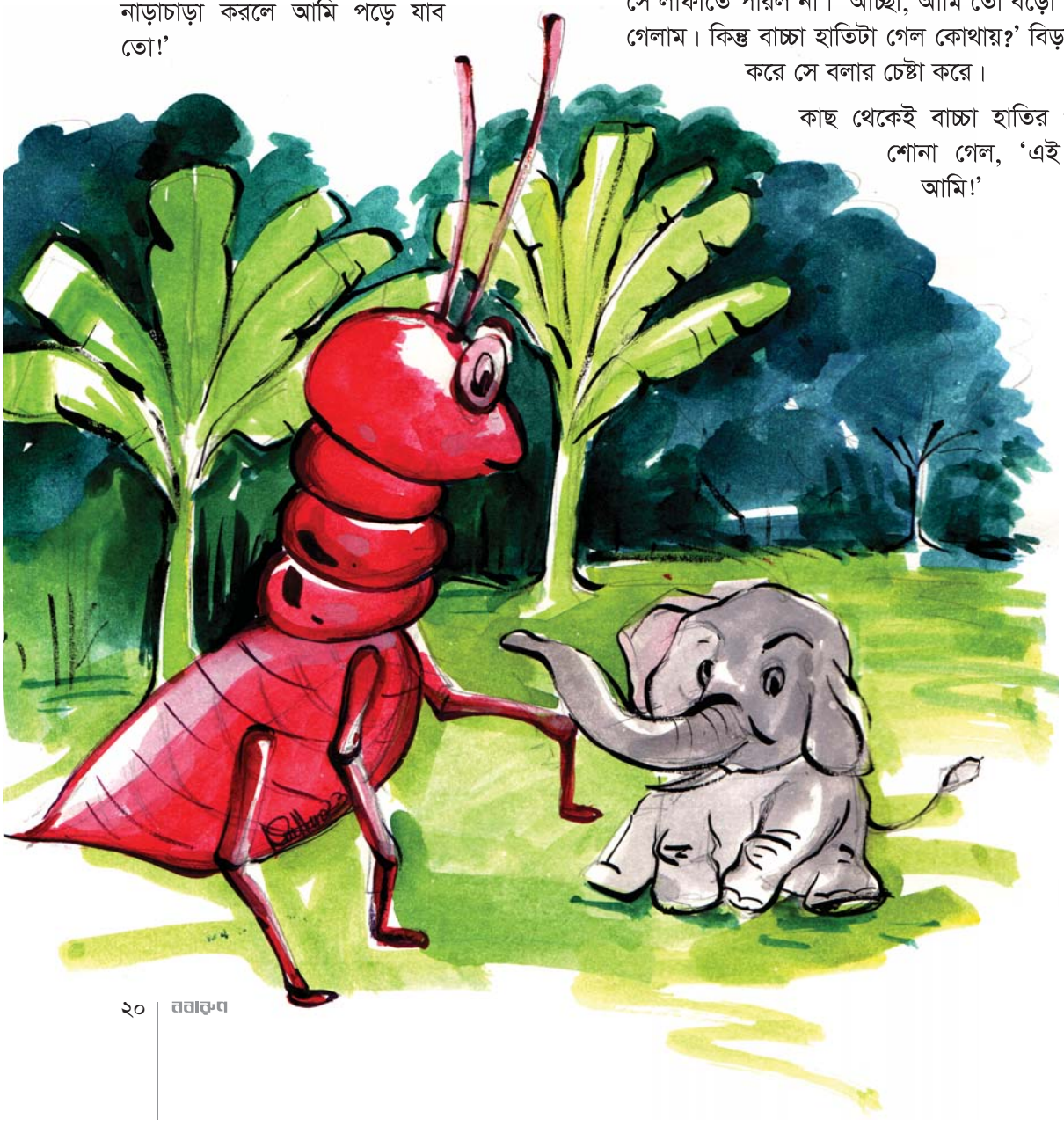

কিন্তু হাতিটাকে বড়ো পিঁপড়া দেখতে পেল না। বলল, 'আমি যে তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না! কোথায় তুমি?'

ছোটো হাতি তার শুঁড় উঁচু করে বলল, 'দেখবে কেমন করে? আমি যে পিঁপড়ার মতো ছোটো হয়ে গেছি!'

পিঁপড়াটা ভালো করে তাকিয়ে দেখে, ছোটো হাতি পিঁপড়ার মতো ছোটো হয়ে গেছে। পিঁপড়া খুশি খুশি গলায় বলল, 'দারুণ ব্যাপার! আমি বড়ো হতে চাচ্ছিলাম। বড়ো হয়ে গেছি। আর তুমি ছোটো থাকতে চেয়েছ। ছোটো হয়ে গেছ। ... এখন তো দেখছি তোমার মা'র কথাই ঠিক। যে যেমন হতে চায়, সে তেমন হতে পারে।'

পিঁপড়ার মতো অতি ছোটো হাতি বলল, 'ছোটো হয়ে আমার ভালোই লাগছে। কিন্তু এমন হলো কীভাবে?'

বিশাল বড়ো পিঁপড়া বলল, 'আমার মনে হয়, তুমি হ্যাঁচ্চো করেছ। সেই হ্যাঁচ্চোর সাথে তোমার পেটের সব বাতাস আমার শরীরে ঢুকে গেছে। আমি তাই বড়ো হয়ে গেছি। আর পেটের সব বাতাস বেরিয়ে যাওয়ার কারণে তুমি ছোটো হয়ে গেছ।'

'কী জানি, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।' অতি ছোটো হাতি বলতে থাকে, 'তবে আমার খুব ভালো লাগছে এখন। শরীরটা ঝরঝরে লাগছে। আসলে, হাতির মতো বড়ো শরীর নিয়ে হাঁটাচলা করাও কষ্ট।'

বিশাল বড়ো পিঁপড়া বলল, 'আমারও ভালো লাগছে। ছোটো শরীর নিয়ে হাঁটতে আমার আবার ভালো লাগত না। একটু বাতাস হলেই ভয় হতো – যদি উড়ে যাই!'

পিঁপড়ার মতো হাতি আর হাতির মতো পিঁপড়া যখন কথা বলছিল, তখন আশেপাশে কেউ ছিল না। থাকলে তারা ভয় পেয়ে যেত, নইলে অবাক হয়ে যেত।

অতি ছোটো হাতি বলল, 'এখন আমি তো আর আগের মতো কলাগাছ খেতে পারব না। আমার জন্য কোন খাবার ভালো হবে তুমি বলতে পারো?'

বিশাল বড়ো পিঁপড়া বলল, 'চিনির দানা খেয়ে দেখতে পারো। চিনির দানা আমাদের প্রিয় খাবার।'

অতি ছোটো হাতি বলল, 'চিনির দানা! না না, অমন খাবার আমরা খাই না। আমার এখনো কলাগাছ খেতে ইচ্ছা করছে।' তারপর একটু থেমে বলল, 'আচ্ছা, তুমি এখন কী খাবে?'

বিশাল বড়ো পিঁপড়া বলল, 'আমার তো এখনো চিনির দানা খেতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু ছোটো ছোটো চিনির দানায় আমার তো পেট ভরবে না।'

অতি ছোটো হাতি বলল, 'তাহলে তুমি কলাগাছ খেয়ে দেখতে পারো।'

'না না, আমরা পিঁপড়ারা কলাগাছ খেয়ে মজা পাই না।' বিশাল বড়ো পিঁপড়া নিজের গালে নিজে টোকা দেয়। তারপর বলে, 'এ তো ভারি মুশকিল হলো!'

'হ্যাঁ, মুশকিলই তো!' অতি ছোটো হাতি বলে। সেও নিজের গালে কান দিয়ে বাড়ি দেয়। তারপর বলে, 'একটা বুদ্ধি বের করো, পিঁপড়া-সর্দার।'

পিঁপড়া বলল, 'আমাকে ভাবতে দাও। তুমিও একটু ভাবো।' এই বলে বিশাল বড়ো পিঁপড়া চোখ বন্ধ করল। অতি ছোটো হাতিও পিঁপড়ার মতো চোখ বন্ধ করে ভাবতে লাগল।

চোখ বন্ধ করে অনেকক্ষণ ওরা ভাবল। কিন্তু খাওয়ার সমস্যার সমাধান কীভাবে হবে, কেউ ভেবে পেল না। 'নাহ্, এভাবে জীবন চলতে পারে না।' বড়ো পিঁপড়া বলতে বলতে চোখ খোলে। কিন্তু এ কী! ছোটো হাতি যে আগের মতো বড়ো হয়ে গেছে!

'নাহ্ এভাবে চলতে পারে না।' বলতে বলতে ছোটো হাতিও চোখ খোলে। খুলে অবাক হয়ে যায়। সে তো আগের মতো হয়ে গেছে। কিন্তু পিঁপড়া কোথায়? সে বলল, 'পিঁপড়া-সর্দার, তুমি কোথায়?'

পিঁপড়া মাথা উঁচু করে বলে, 'এই যে আমি!'

ছোটো হাতি অনেক খুঁজেও পিঁপড়াটাকে দেখতে পেল না। তবে বুঝতে পারল সে আগের মতো ছোটো হয়ে গেছে। তাই বলল, 'তুমি কি আবার ছোটো হয়ে গেলে?'

পিঁপড়ার এবার রাগ হলো। বলল, 'হ্যাঁ, ছোটো হয়ে গেছি। তবে ছোটো হলেও আমি বড়ো পিঁপড়া।'

ছোটো হাতি বলল, 'হ্যাঁ, আর আমি বড়ো হলেও কিন্তু ছোটো হাতি।' ❑

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শুভ জন্মদিন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

ইমরান পরশ

তিনি জন্মেছিলেন বাংলার ছায়া সুশীতল পাখিডাকা একটি গ্রামে। গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে বাইগার নদী। নদীটির কুলুকুলু ঢেউ আছড়ে পড়ে দুই পাড়ে। মাঝে মাঝে কাশফুল দোল খায়। গাঙচিলের ঝাঁক এসে ঝুপ করে ছোঁ মেরে মাছ ধরে। বাইগার ভাগ হয়েছে মধুমতি থেকে। মধুমতির বাচ্চাও বলতে পারো। তোমরা যারা গ্রামে বড়ো হচ্ছো তারা অনেকেই কিছুটা হলেও শহুরে জীবনযাপন থেকে দূরে। তাহলে চিন্তা করো আজ থেকে ৭৬ বছর আগে কেমন ছিল। এখনকার মতো এমন পাকা রাস্তা ছিল না। বৈদ্যুতিক আলোর ঝলকানিও মুগ্ধ করত না। ভালোবাসায় মাখামাখি ছিল। এ বাড়ির পিঠেপুলি ও বাড়িতে যেত। ও বাড়িরটা আসত এ বাড়িতে। কী সুন্দর ছিল তাই না! এমনই সময়ে ১৯৪৭ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম শেখ হাসিনা। তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছার বড়ো সন্তান।

এখনো গ্রামে এমন পরিবেশ আছে বৈকি। এ বাড়ির গাছের নারকেল ও বাড়ির ছেলে-মেয়েদের জন্য একদম ফ্রী। এখন যদিও সময় বদলেছে। কিন্তু বাঙালির আত্মিক মিত্রতা এখনো অটুট রয়েছে। এই অটুট বন্ধনের কারণে ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। তোমরা তোমাদের পাঠ্যবই অথবা গল্প উপন্যাসে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পড়েছ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। আমরা এখন স্বাধীন সার্বভৌম দেশের নাগরিক।

এই যে দেখছ দেশের সড়কের ওপরের রেলসড়ক দিয়ে ট্রেন চলছে। পদ্মা নদীতে বিশাল সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। এটা কিন্তু সেই স্বাধীনতার ফলেই সম্ভব হয়েছে। আর এতকিছু কে করেছেন জানো? তিনি শেখ হাসিনা। তিনি শিশুবান্ধব। গরিবের বন্ধু। বঙ্গবন্ধুর মতোই তাঁর বুকের পাটা অনেক বড়ো। এই যে যাদের ঘর নেই তিনি তাদের ঘর দিয়েছেন। মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত শিশুদের তিনি বুকে টেনে নিয়েছেন। আশ্রয় দিয়েছেন। তিনি তাঁর ছোটো ভাই শেখ রাসেলকে খুব ভালোবাসতেন জানো। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতার পরিবারসহ সেই ছোট্ট শিশুটিকেও কিছু দুষ্টু মানুষ মেরে ফেলেছে। তাই ছোটো বাচ্চাদের দেখলেই তাঁর সেই ছোট্ট ভাইয়ের কথা মনে পড়ে। ভীষণ আদরের ভাই তো। তোমরা যখন বড়ো হবে তখন আরও বিস্তারিত জানতে পারবে।

এই তো কিছুদিন আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইন্সটিটিউটে চোখের ডাক্তার দেখিয়ে হাসপাতাল ত্যাগ করার সময় চিকিৎসা নিতে আসা রোগী ও স্বজন, চিকিৎসক, নার্স, কর্মচারীসহ সবার সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং ছবি তোলেন প্রধানমন্ত্রী। এ সময় শেখ হাসিনার নজর পড়ে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা ছোট্ট রাব্বির দিকে। এগিয়ে যান প্রধানমন্ত্রী। পরম মমতায় আদর করেন শিশুটিকে। প্রধানমন্ত্রী ছোট্ট রাব্বির কাছে জানতে চান কী করে সে, কার সঙ্গে হাসপাতালে এসেছে, কোন ক্লাসে পড়ে।

১১ বছরের রাব্বি জানায়, সে চক্ষু বিজ্ঞান হাসপাতালের ক্যান্টিনে কাজ করে। সেখানেই থাকে। তার বাবা মারা গেছেন। মা রাবেয়া বেগম সুতার কারখানায় কাজ করত। এখন চাঁদপুরে রাম দাসদি আশ্রয়ণ প্রকল্পের ৮/৩ নং ঘরে থাকে। রাব্বির সৎ বাবা জাহাঙ্গীর আলম দিনমজুর। রাব্বি ক্যান্টিনে কাজ নেওয়ার আগে দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছে।

ছোট্ট শিশুটি প্রধানমন্ত্রীকে বলে, 'আমি চাঁদপুরে মায়ের কাছে যেতে চাই। আবার পড়াশোনা করতে চাই।'

ছোট্ট রাব্বির কথা শুনে প্রধানমন্ত্রী আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। পরে রাব্বির পড়াশোনাসহ যে-কোনো প্রয়োজন মেটানোর জন্য ব্যবস্থা করতে সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী। এই হলেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর হৃদয় কুসুমের মতো কোমল। ফুলের মতো পবিত্র। তিনি দেশের মানুষকে খুব ভালোবাসেন। সব সময় দেশের উন্নয়নের কথা চিন্তা করেন। তাঁর জন্মদিনে আমরা তাঁকে শুভেচ্ছা জানাই। শুভ জন্মদিন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। ❑

গল্পকার ও প্রাবন্ধিক

শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু

মহসীন শিবলু

বঙ্গবন্ধু মানে আত্মবিশ্বাস
বাংলা জয়ের ইতিহাস।
বঙ্গবন্ধু মানে অনুপ্রেরণা
মুক্তিকামী মানুষের চেতনা।
বঙ্গবন্ধু মানে আশীর্বাদ
শোষণ-নিপীড়নের প্রতিবাদ।
বঙ্গবন্ধু মানে জাগরণ
৭ই মার্চের ভাষণ।
বঙ্গবন্ধু মানে আদর্শ
সারা বাংলার গর্ব।
বঙ্গবন্ধু মানে ন্যায়
সততা-নিষ্ঠার জয়।
বঙ্গবন্ধু মানে বিসর্জন,
বাংলার মানুষের অর্জন।
বঙ্গবন্ধু মানে শক্তি
বাঙালি জাতির মুক্তি।
বঙ্গবন্ধু মানে সাহসিকতা
বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন

বি এম. লিটন মাহ্‌মুদ

সর্বনাশা পদ্মার বুকে
হারিয়েছে কত প্রাণ,
বঙ্গকন্যা শেখ হাসিনা
সেই পদ্মায় করেছে সেতু নির্মাণ।

হারাবে না আর মায়ের কোলের সন্তান,
বঙ্গকন্যা শেখ হাসিনা
পদ্মার বুকে সেতু করেছে দৃশ্যমান।

বাস, ট্রাক আর রেলগাড়ি
পদ্মার বুক দিবে পাড়ি,
বাংলা চলেছে দুর্বার গতিতে
পদ্মা সেতু উন্নয়নের এক সিঁড়ি।

অবাক চোখে তাকিয়ে আছে বিশ্ব আজ।
পাছে লোকে কিছু বলে
ঘোমটা টেনেছে আজ
হয়ত পেয়েছে লাজ!

ভূষণে লজ্জাবতী
পদ্মা সেতু দৃশ্যমান হয়ত তাহার ক্ষতি।

লক্ষ জনতার সময় লম্বা হবে না অতি
বঙ্গকন্যা শেখ হাসিনা পদ্মার বুকে রেখেছে এক স্মৃতি।
উন্নয়নের সিঁড়ি চলছে আরো চলবে
বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের পদ্মা সেতু
সময়ের স্রোতে কথা বলবে।

আমি মীনার কথা বলছি

পুলক রাহা

চব্বিশে সেপ্টেম্বর মীনা দিবস। এই দিবসে প্রথম মীনা কার্টুন 'মুরগিগুলো গুণে রাখ', বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত হয়েছিল তাই এই দিনটিকে মীনা দিবস হিসেবে পালন করা হয়। আজ তোমাদের কাছে মীনার জন্ম ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা করলাম।

তোমরা নিশ্চয়ই তোমাদের সবার বন্ধু মীনা, মিঠু আর রাজুকে চেনো। আজ আমি তোমাদের মীনার জন্মের সময়কার ঘটনা বলব। মন দিয়ে শুনবে নিশ্চয়ই। সে অনেকদিন আগের কথা। ১৯৯০-এর দশক ছিল কন্যা শিশু দশক। অর্থাৎ মেয়ে শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সম-অধিকারের বিষয়ে সবার মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে আমাদের পাশের সাতটি প্রতিবেশী দেশ ভারত, পাকিস্তান, ভুটান, নেপাল, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা এবং বাংলাদেশ একমত হয়। তখন ইউনিসেফের উদ্যোগে ঢাকায় একটা সভার আয়োজন করা হয় এবং এই সভায় সবাই একমত হন যে একটা মেয়ের অ্যানিমেশন চরিত্র তৈরি করা হবে। যার মাধমে মেয়েদের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়গুলো সকলের সামনে তুলে ধরা হবে। ব্যাস, সবাই কাজে লেগে গেল। ভারতের মুম্বাই শহরে স্যার রামমোহন নামে একজন বিখ্যাত আর্টিস্ট একটা মেয়ের ছবি এঁকে ফেললেন। এই মেয়েটির ছবি পাঠানো হলো বাংলাদেশ, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান, ভুটান এবং শ্রীলঙ্কাতে। সবাই মেয়েটার ছবি দেখে খুব পছন্দ করল। তোমাদের মতো ছোটোদেরও খুব পছন্দ হলো। এখন এর নাম কী রাখা যায়। একেক জন একেকটা নাম দিলেন। কেউ বললেন ওর নাম হবে পারুল, কেউ কেউ বললেন ওর নাম আলো হলে ভালো হবে, কারণ ও সবার মধ্যে শিক্ষার আলো

ছড়াবে। কেউ বললেন ওর নাম মীনা দিলে কেমন হয়। তারপর এই সাত দেশের সকলে মিলে ঠিক করল এই মেয়েটির নাম হবে 'মীনা'। কারণ এই সাত দেশের সকল ধর্মের, গোত্রের মানুষজন মীনা নামটা খুব পছন্দ করল। ফলে আমরা সাহসী, যে-কোনো কথা বলতে ভয় পায় না এবং খুবই বন্ধুসুলভ মেয়ে মীনাকে পেয়ে গেলাম। এরপর মীনার সাথে যুক্ত হলো মীনার বন্ধু মিঠু আর ভাই রাজু।

মীনার অ্যানিমেশন কার্টুন তৈরি করতে প্রথমে আমাদের দরকার হয় একটা গল্প। এই গল্পটা কীভাবে তৈরি হয় জানো? তোমাদের মতো ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েরা একসাথে চিন্তা করে বের করে গল্পটা কেমন হতে পারে। ওরা সবাই মিলে গল্পের প্লট তৈরি করে, চরিত্র ঠিক করে। আমাদের এই কাজে সহায়তা করে থাকে বাংলাদেশ শিশু একাডেমির বন্ধুরা। তারপর আমরা বড়োরা তোমাদের গল্পটা নিয়ে অ্যানিমেশন কার্টুনের জন্য উপযোগী করে তৈরি করি। এরপর অ্যানিমেশন আর্টিস্টদের কাছে পাঠাই। তারা প্রথমে তোমাদের গল্প অনুসারে স্টোরি বোর্ড তৈরি করে। এই স্টোরি বোর্ডটি তোমাদের মতো ছোট্ট ছেলে-মেয়েদের কাছে পাঠানো হয় যাতে তারা মতামত দিতে পারে যেন গল্পটা তাদের মন মতো হয়। তারা যদি কোনো পরিবর্তন করতে চায় বা কিছু যোগ করতে চায় তখন আমরা তাদের কথা অনুসারে এই স্টোরি বোর্ডটির সংযোজন বা পরিবর্তন করি। বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রাম-শহরের ছেলে-মেয়েরা এই মতামত দেবার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে থাকে। স্টোরি বোর্ডটি চূড়ান্ত হবার পরে ডায়ালগ ঠিক করা হয়। তারপর মীনার ভয়েস, মিঠুর ভয়েস, রাজুর ভয়েসসহ অন্যান্য চরিত্রের ভয়েস এবং আনুষঙ্গিক শব্দ ও মিউজিক ধারণ করা হয়। একই সাথে শিল্পীরা স্টোরি অনুসারে অ্যানিমেশনের কাজ করতে থাকে। অ্যানিমেশনের কাজ মোটামুটি শেষ হলে ভয়েস, শব্দ এবং মিউজিক সংযোজন করা হয়। এই পর্যায়ে এই রাফ অ্যানিমেশনটি আবারো তোমাদের মতো ছেলে-মেয়েদের কাছে দেখানো হয়। এইসব ছেলে-মেয়েরা দেখে সন্তুষ্ট হলে তখন চূড়ান্ত এডিট করে প্রচারের জন্য টেলিভিশন ও অনলাইন প্লাটফর্মে দেওয়া হয়

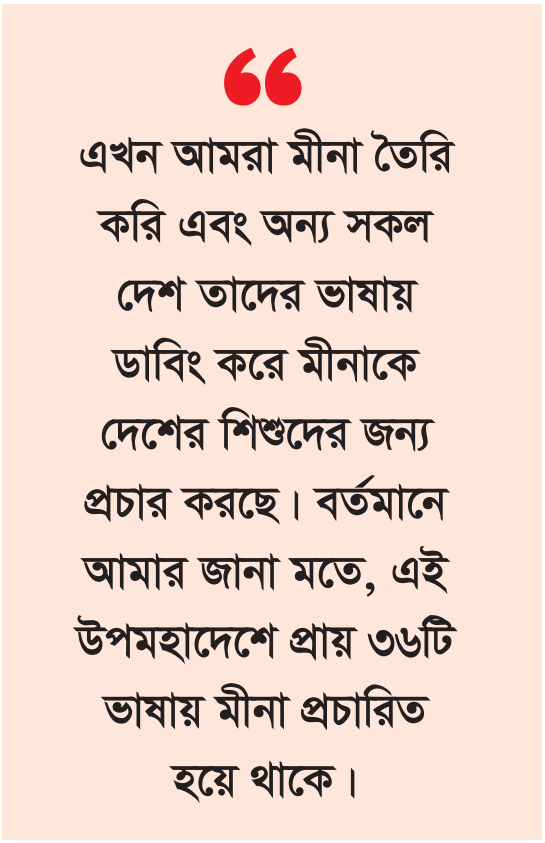

তোমরা সবাই দেখতে পাও।

নব্বই-এর দশকে যখন মীনার কাজ শুরু হয় তখন এই উপমহাদেশে ভালো অ্যানিমেশন করার মতো কোনো স্টুডিও ছিল না। তাই প্রথম দিকের মীনা ফিল্মগুলোর কয়েকটি ফিলিপাইনের হান্না বারবারা স্টুডিওতে করা হয়। পরে স্যার রামমোহন মুম্বাইতে একটি অ্যানিমেশন স্টুডিও স্থাপন করেন– তার নাম ছিল লাইটবক্স। ২০০০ সাল পর্যন্ত লাইটবক্সে বেশ কয়েকটি 'মীনা' কার্টুন তৈরি হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশে মীনা তৈরির কাজ শুরু হয় ২০০৪ সালের দিকে। গ্রিনফিল্ড নামে একটা স্টুডিও প্রথম দিকের অ্যানিমেশনের কাজ করে পরে বেশ কয়েকটি স্টুডিও স্থাপিত হয়। তার মধ্যে টুনবাংলা, ক্লিকহাউজ এবং ড্রিমারডঙ্কি উল্লেখযোগ্য। যদিও বর্তমানে আরো বেশ কিছু অ্যানিমেশন স্টুডিও বাংলাদেশে কাজ করছে। তবে একথা বলা যায় মীনার কাজ দিয়েই বাংলাদেশে অ্যানিমেশনের কাজের একটা যুগ শুরু হয়েছে। আগে

অন্য দেশে মীনা তৈরি হতো এবং আমরা বাংলাতে ডাবিং করে পরে মীনাকে এ দেশে প্রচার করতাম। এখন আমরা মীনা তৈরি করি এবং অন্য সকল দেশ তাদের ভাষায় ডাবিং করে মীনাকে সে দেশের শিশুদের জন্য প্রচার করছে। বর্তমানে আমার জানা মতে এই উপমহাদেশে প্রায় ৩৬টি ভাষায় মীনা প্রচারিত হয়ে থাকে।

তোমরা নিশ্চয়ই ইউনিসেফের নাম শুনেছ– যারা সারা বিশ্বের শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তাসহ শিশুদের সকল প্রকার অধিকার নিয়ে কাজ করে। সেই ইউনিসেফের উদ্যোগেই মীনার কাজ শুরু হয় এই উপমহাদেশে। নীল ম্যাকি নামে একজন ইউনিসেফের কর্মীই প্রথম চিন্তা করেছিলেন শিশুরা বিনোদন পাবে পাশাপাশি কিছু শিখতেও পারবে এই কার্টুনের মাধ্যমে। মীনা তৈরিতে প্রথম যারা কাজ করেছেন তারা হলেন- পাকিস্তান থেকে রানা সাইদ,ভারত থেকে রুচিতা তালুকদার, সূধা মূরালী, গীতা আথারীয়া, টমাস, বাংলাদেশ থেকে জুন কানুগী, মীরা মিত্র, তাসমিয়া বাশার, সাইদ মিল্কী এবং নেপাল থেকে দত্তা রায়।

মীনার যে গানটি শুনলে সকলের মন-প্রাণ উদ্বেলিত হয়ে ওঠে সেই 'আমি বাবা-মায়ের শত আদরের মেয়ে'– গানটি লিখেছিলেন ফয়সাল কায়সার ও আরশাদ মাহমুদ এবং এই কালজয়ী গানটি গেয়ে হাজার মানুষের মনে দোলা লাগিয়েছেন টিনা সানি এবং সুষমা শ্রেষ্ঠা। আর কে কে মীনা, রাজু, মিঠু , মা, বাবা আর দাদির গলা দিয়েছে জানতে ইচ্ছে করছে তাই না। প্রথম যখন মীনা কার্টুন তৈরি হয় তখন মীনা, রাজু, মিঠুর গলা দিয়েছিল যথাক্রমে, রাজশ্রী নাথ, কমল যাদব, পাঞ্চাল মায়াখার এবং পিনাকী মূখার্জী। আর বাংলাদেশে যখন শুরু করি তখন মীনার কণ্ঠ দিয়েছেন প্রমিতা গাঙ্গুলী, মিঠুর গলা দিয়েছেন কামরুল আহসান মিঠু, মীনার মায়ের কণ্ঠ দিয়েছেন তানজিম আরা পল্লী, বাবার কণ্ঠ দিয়েছেন টুকু মজনিউল এবং দাদির কণ্ঠ দিয়েছেন ওয়াহিদা মল্লিক জলি।

বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামে এখনো মীনা সকলের আদরের এবং সকলে মীনার কথা মনে করে তাদের মেয়ে শিশুকে আজ স্কুলে পাঠায়, মেয়েদের সঠিক যত্ন নেয় এবং মেয়েরা যে পরিবারের সম্পদ তা বুঝতে শিখেছে। আজও শিশুরা খাবার আগে, বাথরুম থেকে ফিরে সাবান দিয়ে হাত ধোয়। মীনা আমাদের সকলের আদরের ঘরের মেয়ে। এখন সে শুধু মেয়ে শিশুদের কথা বলে না, সে এখন সকল শিশুদের অধিকারের প্রতীক হয়ে আছে এবং থাকবে। ❑

সিইও, টিম এসোসিয়েটস্ এবং সাবেক কনসালটেন্ট ইউনিসেফ, বাংলাদেশ

আমরা নতুন শিশু

অসিত কুমার মন্ডল

আমরা যুগের নতুন শিশু
চঞ্চল মোদের চিত্ত;
নতুন নেশায় চলছি ছুটে
স্বপ্ন দেখে নিত্য।

নতুন যুগের নতুন ভোরে
আমরা উঠি জেগে,
মনের মাঝে নবীন আশার
রং গিয়েছে লেগে।

ছুটছি মোরা অসীম পথে
অনন্ত পথ পেরিয়ে;
ভুল ঠিকানায় যাব না কেউ
খারাপ পথে হারিয়ে।

নতুন জ্ঞানের আলোয় যেন
জীবন মোদের ঘেরা;
যুগের নেশায় চলছি ছুটে
আমরা হবো সেরা।

হারিয়ে যাওয়া

আনোয়ারুল হক নূরী

নীল আকাশে পাখি হারায়
আমি হারাই মন।
বাঁশি হারায় সুরের লহর
সুর তোলে যে ক্ষণ।

ঝরনা হারায় নদীর কোলে
ঢেউয়ের পাহাড় গড়ে।
চাঁদ হারানো জোছনা জ্বলে
জোনাক পিঠে চড়ে।

আটকে থাকার দেহ নাটাই
টান দেয় বারে বারে।
আটকানো এই মন পাখিটি
দুঃখ বোঝায় কারে?

ওই যে উছল নদীর সাথে
চোখের জলের বাসর।
গন্ধরাজের গন্ধ ছুঁয়ে
বসছে মনের আসর।

হারিয়ে যায় চঞ্চলা মন
কাজল মেঘের কাছে।
হারিয়ে যাওয়ার আনন্দে তাই
মনটা আমার নাচে।

গল্প

উদ্ভ্রান্ত এক অহংকারী ব্যাঙ

আহমাদ স্বাধীন

একটা ব্যাঙ একদিন হঠাৎ করে আকাশে উড়তে শুরু করল। সোনালি রঙের ব্যাঙটাকে আকাশে উড়তে দেখে দোয়েল বলল— কী রে ভাই, হুট করে তুমি আকাশে এলে কেন?

আকাশে আসা কী নিষেধ আছে নাকি?

না, আমি তা তো বলছি না, বলছি তুমি তো আর আকাশের পাখি না।

তো কী হয়েছে, তুমিও তো জলের ব্যাঙ না, তবু তো দিব্যি জলের কাছে গিয়ে পোকামাকড় ধরে খাও, তখন কি আমরা কিছু বলি?

না, তা বলবে কেন? সেখানে আমি খাবারের জন্য যাই, তাই বলে আকাশে তো আর তোমার কোনো খাবার থাকে না যে এখানে তোমাকে উড়ে আসতে হবে।

খাবার না থাক, ইচ্ছে হতে পারে না? আমার ইচ্ছে হয়েছে তাই আসছি। একদিন দুইদিন না, আমি কিছু সময় আকাশে ওড়ার জন্য টানা ১৭ বছর অনুশীলন করেছি। তারপরেও পারিনি। তারপর একদিন দেখলাম নদীর পাড়ে একটা সারস অসাবধানে হাঁটছে। আমিও সুযোগ নিয়ে নিলাম। একলাফে সারসের গলা কামড়ে ছিঁড়ে ফেললাম। তারপর ওর শরীর থেকে পাখনা জোড়া নিয়ে তবেই উড়তে বের হলাম আকাশে। এখন আমাকে কী তোমার কাছে জবাব দিতে হবে? নাকি আকাশের চৌকিদারের দায়িত্ব পেয়েছ তুমি?

আরে বাবা, একটু জানতে চাইলাম বলে তুমি এমন করে কথা বলছ কেন? তুমি তো বাপু ঝগড়াটে এক ব্যাঙ

আর অপরাধীও। তোমার সাথে কথা বলাটাই আমার ভুল হয়েছে। মাফ করো ভাই, তুমি আকাশে থাকো, না হয় পাতালে থাকো তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমি শুধু তোমাকে সতর্ক করতে আসছিলাম। তোমার পেছনে একটা বড়ো ঈগল উড়ে আসছে। হয়ত কিছুক্ষণের মধ্যেই ধরে ফেলবে তোমাকে। আর তারপর কী হবে তা তো বুঝতেই পারছ।

সোনালি ব্যাঙটা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল- তা এই কথাটা এত দেরিতে বললে কেন?

আগে বলার সুযোগ দিলে তো বলব। এতে অবশ্য ভালোই হলো, তুমি তো নদীর ধারের এক সারসের অসতর্কতার সুযোগ নিয়েছিলে। এখন তোমার বেলাতেও সেটা ঘটলে মন্দ হয় না। আমার মনে হয় সারসের থেকে তোমার পরিণতি খুব একটা ভালো হবে না।

ব্যাঙ এবার করুণ গলায় দোয়েলের কাছে মিনতি করে বলল– দয়া করে আমাকে কি তুমি সাহায্য করতে পারো?

জবাবে দোয়েল সহজ করেই বলল– তুমি ভালো কোনো প্রাণী না। তুমি অপরাধী, তাই তোমাকে সাহায্য করলে আমারও অপরাধ হবে। তারচেয়ে বরং তোমার সাজা হওয়াটাই ভালো। আমি যাই, সোনালি ঈগলটাকে ওই যে দেখা যাচ্ছে। তুমি তোমার সাজা ভোগ করতে তৈরি হও।

বিশাল বড়ো একটা ঈগল পাখি এসে উড়ন্ত সেই অহংকারী ব্যাঙটাকে গিলে ফেলল সহজেই। ❐

গল্পকার

শরৎ রানি

আহসানুল হক

শরৎ রানি ঘোমটা খুলে
কী অপরূপ রূপ ;
সেই রূপেতে মুগ্ধ যে হয়
শিল্পী -কবি খুব !

শাদা মেঘের পাহাড় জমে
দূর আকাশের গায়
দেখবে শরৎ, এসো তবে
হালদা পাড়ের গাঁয় !

জ্যোৎস্না আলোয় যায় ভেসে যায়
গ্রাম-চরাচর, সব
ভোর সকালে হালকা শিশির
পাখির কলরব !

বকের সারি দেয় তো পাড়ি
ঘনায় যখন সাঁঝ
প্রকৃতিও খুলতে থাকে
রুপ- লাবণ্য ভাঁজ !

মাঠ-প্রান্তর,নদীর তীরে
দোলে কাশের ফুল
শরৎ হলো ঋতুর রানি
নেই কোনো এর তুল !

রঙিন শরৎ

শাহরিয়ার শাহাদাত

হাওয়ার নাচন কী কুড়মুড়ে
কামার দিঘির দু'ধার জুড়ে
নরম কাশের গাল,
বৃষ্টি আধো; কোথায় হারায়-
সূর্য্যি বুঝি রয় পাহারায়?
আসলো শরৎকাল !

হাতছানি দেয় আকাশ বাড়ি
জড়িয়ে নিলো নীলাভ শাড়ি
শুভ্র মেঘের পাল,
যাচ্ছে কোথায় মেঘের পালক
মন উঠোনে আঁকছে বালক
রঙিন শরৎকাল !

রোদকুঁড়ি রোদ মাখায় আদর
সবুজ পাতায় ক্লান্ত ভাদর
পড়ছে পাকা তাল,
মন ছুটে যায় শিউলি তলে
দুপুর ঝিমায় যে অঞ্চলে
নামলো শরৎকাল !

ঝির-ঝির-ঝির শীতল কাঁপন
জোছনা জরি করল আপন
রাত্রি টালমাটাল,
ঠিকরে পড়ে চাঁদের আলো
শিশির বনে ঘুম পাড়ালো
নিঝুম শরৎকাল !

গল্প

কুড়িয়ে পাওয়া শাল্লিক ছানা

আবুল হোসেন আজাদ

স্কুলের টিফিন পিরিয়ডের পর ক্লাসে মন বসছে না ইফাতের। মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে। কখন ছুটি হবে। তাছাড়া এখনও ছুটি হতে দুই পিরিয়ড বাকি। অস্থির হয়ে ওঠে ইফাত। ক্লাসে স্যারের পড়ানোয় মন নেই। স্যার কী পড়াচ্ছেন সেটাও ওর যেন কানে যাচ্ছে না। এমন ক্লাসে অমনোযোগী দেখে স্যার প্রশ্ন করেন–

: ইফাত আমি কী বলছিলাম ?

: স্যার... স্যার...

আমতা আমতা করতে থাকে ইফাত মাথা নিচু করে। স্যার বুঝতে পারে ইফাত কিছুই শুনছে না। আবার প্রশ্ন করে ইফাতকে–

: কোনো সমস্যা ? শরীর খারাপ লাগছে ?

ইফাতের কোনো উত্তর নেই মুখে। স্যার ওকে ক্লাসে মন দিতে বলে পড়াতে শুরু করলেন। ইফাত স্যারের ক্লাসটা শেষ করল এমনি করে। ইফাত ভাবতে থাকে এখনও দুটি পিরিয়ড শেষে বাজবে ছুটির ঘণ্টা। সে তো অনেক বাকি। কিছু করার নেই। স্যারের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে বাড়ি ফিরবে। তাও হবার নয়। হেডস্যার কড়া মানুষ। ছুটি চাইতে গেলে কারণ জানতে চাইবে। তখন কারণটা বলা যাবে না।

অপেক্ষা আর শেষ হতে চায় না। দুটো ক্লাস মনে হচ্ছে ইফাতের যেন দুই ঘণ্টা ধরে হচ্ছে। এভাবেই ক্লাস দুটো শেষ হয়ে গেল। ইফাতের তবু মনে হলো আজ বুঝি ঘড়ির কাঁটা এগুচ্ছে না। এক জায়গায়

বুঝি ঠায় দাঁড়িয়ে আছে কাঁটাগুলো। শেষমেষ ঢং ঢং করে ছুটির ঘণ্টা বাজালো স্কুলের দপ্তরি ইসমাইল। স্কুল ব্যাগটা পিঠে ঝুলিয়ে বাড়ির দিকে রওনা দিলো দ্রুত পায়ে। এক রকম দৌড়াতে দৌড়াতে। ইফাত ক্লাস সিক্সে পড়ে। বাড়ি থেকে স্কুল বেশি দূর না। দশ মিনিটের পথ। ওদের হাই স্কুলের কম্পাউন্ডের ভিতরে প্রাইমারি স্কুল। স্কুলের গেট পেরুলেই বাজার, ইউনিয়ন পরিষদের বিল্ডিং, পোস্ট অফিস ও বড়ো বড়ো দোকানপাট।

বাড়ি ঢুকেই স্কুল ব্যাগটি কোনোরকমে পিঠ থেকে নামিয়ে এক রকম ছুঁড়ে দেয় পড়ার টেবিলে। মা ছিলেন ঘরে। ওর জন্য প্লেটে করে ভাত-তরকারি গুছিয়ে দেয়। ডাকেন ইফাতকে। হাত-মুখ ধুয়ে তাড়াতাড়ি করে নাকেমুখে গুজে খাওয়া শেষ করে ইফাত। মা-ও বুঝতে পারেন না ছেলের এত তাড়া কীসের আজকে।

মা বললেন : কীরে এত তাড়াহুড়ো করছিস কেন? কোথাও যাবি নাকি ?

ইফাত বলল : হ্যাঁ মা।

: কোথায় ?

: পরে শুনো মা। এখন কথা বলার সময় নেই। হুড়মুড় করে বেরিয়ে গেল ইফাত। পকেটে একটি পলিথিন ব্যাগ ঢুকিয়ে নিলো। সাথে হাতে একটি খেজুরের ডাল। নিচের পাতাগুলো ছাড়িয়ে উপরের দিকে কয়েকটি চিকন পাতা রাখা। মা এইবার বুঝতে পারেন কিছুটা। কিন্তু কিছুই বললেন না।

পড়ন্ত বিকেল। সূর্য হেলে পড়ছে অনেকটা। রোদের তেজ কমে গেছে। এখন শীতকাল। শীত শীত লাগছে ইফাতের। একটি মাত্র শার্ট গায়ে চাপিয়ে বের হয়েছে। চারিদিকে পাখির কিচিরমিচির। ওদের বাড়ি থেকে একটু দূরে বিশাল মাঠ। এখন সেখানে বোরো ধানের চারাগুলো সবুজ হয়ে উঠেছে। ইফাত ধানক্ষেতের আলপথে পা চালায়। চোখ রাখে আলের সবুজ ঘাসের উপরে। ওখানে বসে থাকে ঘাসফড়িং। ও ঘাসফড়িং ধরবে। হাতে খেজুরের ডালটা উঁচু করে রাখে। ইফাতের পায়ের শব্দ পেয়ে ফড়িংগুলো উড়ে গিয়ে ধানক্ষেতের মধ্যে ঢুকে যায়। একটি ফড়িংও ধরতে পারে না। মনটা খারাপ হয়ে যায় ইফাতের। ফড়িং ধরতে না পারলে ওরা কি না খেয়ে থাকবে? এমন ভাবতে ভাবতে ধীরে ধীরে এগুতে থাকে। যেন পায়ের শব্দ ফড়িংয়ের কানে না যায়। তবু কাজ হয় না। ফড়িংগুলো লাফ দিয়ে দিয়ে উড়ে যায়। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে ইফাত। সবুজ ধান গাছগুলোর মাথায় মাকড়সার বাসা। হালকা কুয়াশায় মাকড়সার জালগুলো ঢেকে আছে। ও একবার মনে করল জালপাতা মাকড়সাগুলোকে ধরে নিয়ে যাই। যেই ভাবা সেই কাজ। ইফাত ধানক্ষেতের মধ্যে নামল। কিন্তু ওখানেও ওর সাড়া পেয়ে মাকড়সাগুলো জাল ছেড়ে পালালো। না তাও হলো না। বেলা ডুবে যাচ্ছে। পশ্চিম আকাশ সিঁদুর রঙে রেঙে উঠেছে। বেশিক্ষণ দেরি করা যাবে না। মাগরিবের আজানের সময় হলো প্রায়। সে কাদামাটির ধানক্ষেত ছেড়ে উঠে আসে আলে। এবার খুব ধীরে ধীরে ফড়িংদের কিছু বুঝে উঠার আগেই সপাং করে বাড়ি দেয় ঘাসে থাকা ঘাস ফড়িংয়ের উপর। এবার তিন-চারটি ফড়িং একসাথে চিৎপটাং হয়। খপ খপ করে ধরে ইফাত পকেট থেকে পলিথিন বের করে ওর মধ্যে ঢুকিয়ে নেয়। আবারও এগুতে থাকে। এগুতে এগুতে প্রায় বিলের মাঝখানে এসে পড়েছে। এদিকে আরো নির্জন ও অন্ধকারের মতো। একইভাবে আরো কয়েকটি ফড়িং ধরে ইফাত। এবার বাড়ির পথে ফিরে আসে।

এতক্ষণে বেলা ডুবে গেছে। এখনও আলোর রেশ রয়ে গেছে চারিদিকে। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমে আসছে। কটা বক উড়ে যাচ্ছে উত্তর দিক থেকে দক্ষিণে তাদের বাসায়। মাগরিবের আজান ভেসে আসছে মসজিদের মাইক থেকে। দ্রুত পা চালায় ইফাত। আযান শেষ হওয়ার পর পরই বাড়িতে এসে পৌঁছায়।

ইফাতকে ফিরতে দেখেই মা মাগরিবের নামাজ শেষ করে বলে উঠল :

এতক্ষণে তাহলে ফেরার সময় হলো। পড়তে বসতে হবে না ?

ইফাত মাকে বলে : মা এই তো এসেছি পাখির ছানা দুটোকে খাইয়ে পড়তে বসছি। মা ততক্ষণে ছেলের কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে যায়। ছানা দুটির জন্য ইফাতের মমতা দেখে মার ভালোই লাগে। তবু মুখ ফুটে কিছু বলে না।

ইফাত ভোরবেলা কুড়িয়ে পাওয়া শালিক ছানা দুটিকে একটি ছোটো ঝুড়ির মধ্যে খড়কুটো দিয়ে তাতে রেখেছিল। মা-ও জানে ব্যাপারটা। ইফাত বাবাকে বলেছিল একটি খাঁচা কিনে দেবার জন্য। বাবা রাজি হয়নি প্রথমে। তবে ছানা দুটিকে দেখে তারও মায়া পড়ে যায়।

: হবে বাবা হবে। এই কথা বলে বাবা কাজে বেরিয়ে যান। ওর বাবা দিনমজুর। সারাদিনে চৌধুরীদের ক্ষেত-খামারে কাজ করেন। দুপুরে চৌধুরীদের ওখানেই খেয়ে নেন। বাড়িতে ফেরেন সেই সন্ধ্যায়।

কাল শেষ রাতে হঠাৎ একটি দমকা ঝড় এসে সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। ইফাতদের বাড়ির পূর্ব পাশে পুকুরের ধারে একটি মাঝারি আকারের লিচু গাছ। এই লিচু গাছের মগডালে দুটি ডালের মাঝখানে বাসা বেঁধে একটি শালিক দুটি ছানা ফুটিয়ে ছিল। ইফাত শালিকের বাসাটা দেখে প্রতিদিন। চোখে চোখে রাখে। তাই তো আজ ভোর হওয়ার সাথে সাথে লিচু গাছ তলায় চলে যায়। উপরে তাকিয়ে দেখে বাসাটা নেই। গাছতলার কয়েক হাত দুরে দেখে বাসাটা ভেঙে পড়ে আছে। হাতে তুলে নেয় ইফাত বাসাটা। আর সাথে সাথে চিঁচিঁ ডেকে ওঠে শালিকের ছানা দুটো। পরম আদরে ছানা দুটোকে বাড়িতে নিয়ে আসে। মাকে বললে তিনি একটা ছোটো ভাঙা ঝুড়ি দেন ইফাতকে। সেই ঝুড়িতে রেখে দেয় ছানাদের। মা'র হাঁড়িতে পান্তাভাত ছিল। তাই নিয়ে এসে পাখি দুটোকে খাওয়ায়। ওতে ওরা একটু শান্ত হয়। ইফাত জানে ওদের প্রধান খাবার পোকামাকড়। তাই তো ইফাত স্কুল থেকে ফিরেই ফড়িং ধরতে বেরিয়েছিল মাঠে।

ছানা দুটোকে ইফাত ফড়িংগুলো খাইয়েছে। ওরা চিঁ চিঁ করতে করতে গপ গপ করে ফড়িংগুলো খেয়ে নেয়। এবার হাতমুখ ধুয়ে পড়তে বসে ইফাত। আর মনে মনে বলে বাবা খাঁচা কিনে দিলে সেখানে রেখে ওরা যখন উড়তে শিখবে তখনই ওদের আকাশে উড়িয়ে দেবে। এইসব ভাবতে ভাবতে ইফাত বই খুলে বসে থাকে আনমনে। পূব আকাশ জুড়ে ততক্ষণে গোল চাঁদ উঠেছে। চাঁদের জোছনায় অন্ধকার সরে গিয়ে গাছপালা গুলো ঝিকমিক করছে। বাবা চৌধুরীদের বাড়ি থেকে ফিরে এসে পাশে বসে। ইফাতকে বই খুলে বসে থাকতে দেখে প্রশ্ন করেন-

কীরে ইফাত পড়াশুনা হচ্ছে কই ? বাবার কথায় চমকে ওঠে ইফাত। এবার পড়ায় মন দেয়। বাবা দেখে খুশি হয়। আর ইফাতকে বলে :

কালই তোর জন্য দোকান থেকে খাঁচা কিনে নিয়ে আসব। বাবার কথায় ইফাতের চোখ দুটো ঝিলিক দিয়ে উঠে।

খুশিতে মনটা ভরে ওঠে। কুড়িয়ে পাওয়া শালিক ছানা দুটো উড়বে নীল আকাশের ঠিকানায়। ইফাত ভাবনাগুলো সরিয়ে রেখে একমনে পড়তে থাকে। ❐

গল্পকার

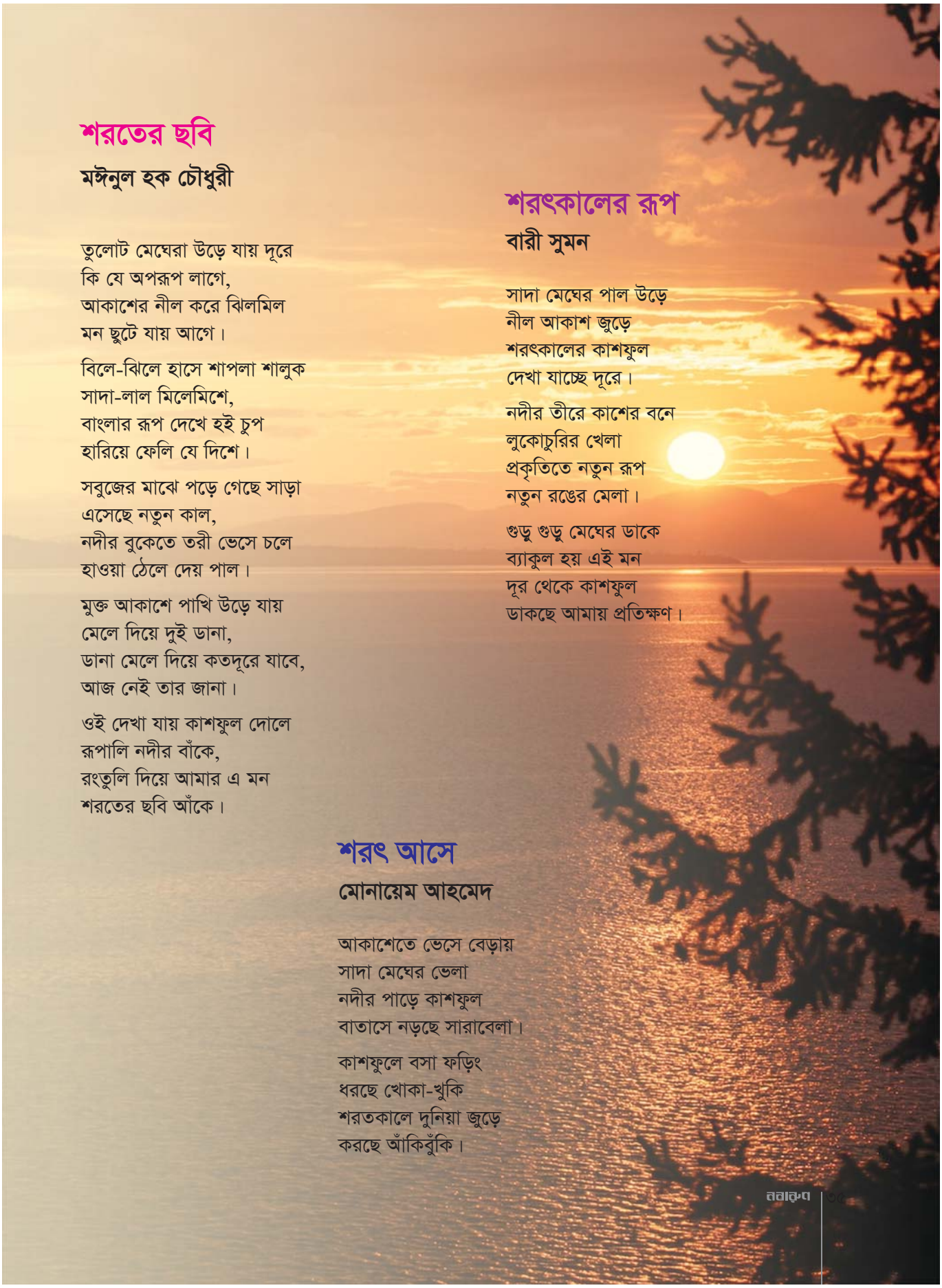

শরতের ছবি

মঈনুল হক চৌধুরী

তুলোট মেঘেরা উড়ে যায় দূরে
কি যে অপরূপ লাগে,
আকাশের নীল করে ঝিলমিল
মন ছুটে যায় আগে।

বিলে-ঝিলে হাসে শাপলা শালুক
সাদা-লাল মিলেমিশে,
বাংলার রূপ দেখে হই চুপ
হারিয়ে ফেলি যে দিশে।

সবুজের মাঝে পড়ে গেছে সাড়া
এসেছে নতুন কাল,
নদীর বুকেতে তরী ভেসে চলে
হাওয়া ঠেলে দেয় পাল।

মুক্ত আকাশে পাখি উড়ে যায়
মেলে দিয়ে দুই ডানা,
ডানা মেলে দিয়ে কতদূরে যাবে,
আজ নেই তার জানা।

ওই দেখা যায় কাশফুল দোলে
রূপালি নদীর বাঁকে,
রংতুলি দিয়ে আমার এ মন
শরতের ছবি আঁকে।

শরৎকালের রূপ

বারী সুমন

সাদা মেঘের পাল উড়ে
নীল আকাশ জুড়ে
শরৎকালের কাশফুল
দেখা যাচ্ছে দূরে।

নদীর তীরে কাশের বনে
লুকোচুরির খেলা
প্রকৃতিতে নতুন রূপ
নতুন রঙের মেলা।

গুড়ু গুড়ু মেঘের ডাকে
ব্যাকুল হয় এই মন
দূর থেকে কাশফুল
ডাকছে আমায় প্রতিক্ষণ।

শরৎ আসে

মোনায়েম আহমেদ

আকাশেতে ভেসে বেড়ায়
সাদা মেঘের ভেলা
নদীর পাড়ে কাশফুল
বাতাসে নড়ছে সারাবেলা।

কাশফুলে বসা ফড়িং
ধরছে খোকা-খুকি
শরতকালে দুনিয়া জুড়ে
করছে আঁকিবুঁকি।

নীলাকাশ ও কাশফুলের ঋতু

নুসরাত জাহান

ঋতু পরিক্রমার তৃতীয় ঋতু শরৎকাল। গঠিত হয় ভাদ্র ও আশ্বিন মাস নিয়ে। খ্রিষ্টীয় পঞ্জিকা অনুসারে, মধ্য আগস্ট থেকে মধ্য অক্টোবর পর্যন্ত শরৎ ঋতুর পথচলা। সবুজ-শ্যামল আর পাখির গুঞ্জনে মুখরিত আমাদের প্রিয় এই বাংলাদেশ।

অপূর্ব রূপ এবং অফুরান সম্ভার নিয়ে প্রতি বছর আবর্তিত হয় ছয় ঋতু। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত এই হলো ছয় ঋতু। দুই মাসে হয় একটি ঋতু। ঋতুভেদে মাসগুলো হলো: বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ গ্রীষ্মকাল, আষাঢ়-শ্রাবণ বর্ষাকাল, ভাদ্র-আশ্বিন শরৎকাল, কার্তিক-অগ্রহায়ণ হেমন্তকাল, পৌষ-মাঘ শীতকাল, আর ফাল্গুন-চৈত্র বসন্তকাল। প্রতিটা ঋতুতেই প্রকৃতির রূপ ভিন্ন ভিন্ন।

ঝকঝকে কাচের মতো স্বচ্ছ নীলাকাশ আর তার মধ্যে পেঁজা তুলার মতো সাদা মেঘমালা এসব নিয়েই প্রকৃতি বরণ করে নেয় শরৎকালকে। শরতের আগমনে প্রকৃতি রং ছড়ায়।

এ সময় কাশফুলের মৃদু দোলা যে-কারো মনকে নিমিষেই করে আপ্লুত। ঋতুর কথা ভুলে গেলেও কাশফুল দেখেই বুঝা যায় শরৎ এসেছে। সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি কালিদাস। তিনি তাঁর (ঋতুসংহার) কাব্যে লিখেছেন, 'কাশফুলের মতো যার পরিধান, প্রফুল্ল পদ্মের মতো যার মুখ, উন্মুক্ত হাঁসের ডাকের মতো রমনীয় যার নূপুরের শব্দ, পাকা শালি ধানের মতো সুন্দর যার ক্ষীণ দেহলতা, অপরূপ যার আকৃতি সেই নববধূর মতো শরৎকাল আসে।' বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাই বলেছেন,

এসেছে শরৎ, হিমের পরশ
লেগেছে হাওয়ার পরে
সকাল বেলায় ঘাসের আগায়
শিশিরের রেখা ধরে।

শরৎ-সন্ধ্যায় গ্রামের মেঠোপথে যেতে যেতে পথিকের মনে নতুন নতুন ভাবনার উদ্রেক হয়। শরৎ যেন প্রতিটি সাধারণ মানুষের মধ্যে কবি ভাবকে জাগ্রত করে দেয়। শরৎ নিয়ে মানুষের এমন মুগ্ধতা কয়েকশ বছরের নয়। এ মুগ্ধতা হাজার বছরের। একাধিক কবি শরৎ নিয়ে একাধিক কবিতা ও গান লিখেছেন। শরতের পরিষ্কার সুনীল আকাশ, ধানক্ষেতে বাতাসের খেলা আর আকাশে সাদা মেঘের ভেসে বেড়ানো দেখে ভালো লাগার খেলা মনে খেলে যায়। তাই বলে দিয়েছেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর–

'আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায় লুকোচুরির খেলা
নীল আকাশে কে ভাসালো সাদা মেঘের ভেলা।'

শরতের শিশির ভেজা সবুজ পথে নানা ফুল ঝরে পড়ে। যা কবি মনে অনাবিল আনন্দের সঞ্চার করে। সেজন্য ভোরের আলোতে কবির হৃদয় হয়ে ওঠে সতেজ ও প্রাণবন্ত। কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাই পথিককে শরতের শিউলি বিছানো পথে হাঁটতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন–

'এসো শারদ প্রাতের পথিক
এসো শিউলি বিছানো পথে।
এসো ধুইয়া চরণ শিশিরে
এসো অরুণ-কিরণ রথে।'

শরৎ মানেই পাকা তাল। ঘরে ঘরে তালের পিঠা খাওয়ার ধুম পড়ে যায়। তাল দিয়ে তৈরি পিঠা আর পায়েস খেতে খুবই মজা। তাল ছাড়াও আমলকি, জলপাই, অরবরই, করমচা, চালতা ইত্যাদি মৌসুমি ফল পাওয়া যায় এই সময়।

শরৎ প্রতি বছর বাঙালির জীবনে নিয়ে আসে নতুন আবেদন ও আবহ। এভাবেই চলে এসেছে হাজার বছর এবং আগামিতেও চলবে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কবির ভাষায়–

শরৎকালে মন বলে নেচে উঠি উৎসবের নেশায়,
বাঙালির সেই প্রাণের উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজায়।
অপূর্ব রাত-দিন মায়াবী রঙিন শরতের রূপ প্রাণবন্ত,
হেসে উঠে নদী তটে গ্রাম বাংলার বিস্তৃত দিগন্ত। ❐

সম্পাদক, নবারুণ

গল্প

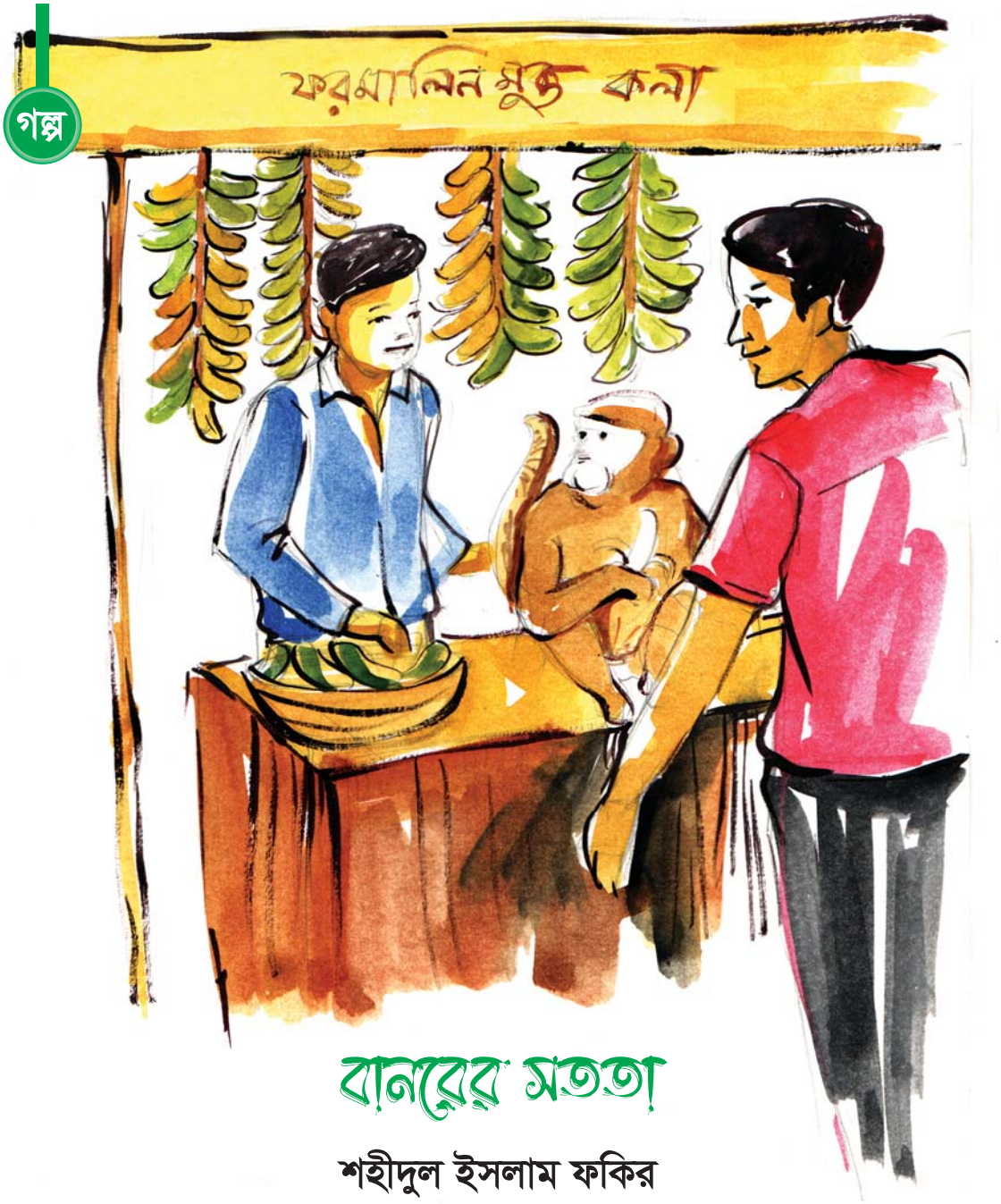

বানরের সততা

শহীদুল ইসলাম ফকির

এক লোক একটি বানর নিয়ে গ্রামে ঘুরে ঘুরে খেলা দেখাতো। বানরটি তার মালিকের কথামতো ডিগবাজি দিত। উপস্থিত দর্শকদের নানানভাবে আনন্দ দিয়ে মাতিয়ে রাখত। একদিন এক দর্শক চিপস খেতে খেতে খেলা দেখছিল, হঠাৎ বানরটি লাফ দিয়ে চিপসের প্যাকেটটি থাবা দিয়ে নিয়ে খেতে শুরু করল। কয়েকটি চিপস খাওয়ার পর প্যাকেটটি ওই লোকের কাছে ফিরিয়ে দিতে চাইল। লোকটি বলল, তুমি সবগুলো খেয়ে নাও, আমি খুশি আছি। বানর এই কথা শুনে বমির অভিনয় করতে লাগল।

উপস্থিত লোকজন ঘটনাটি দেখে বানরের মালিককে প্রশ্ন করলেন, আপনার বানর এমন করছে কেন? কী হয়েছে! বানরের মালিক উত্তর দিলো, বাজারের সব চিপস ভালো নয়, অনেক চিপস খেয়ে বাচ্চাদের নানা সমস্যা হয়। এই চিপসটি খেতে বানর নিষেধ করল। তারপর দিন ওই একই ব্যক্তি ইচ্ছে করে এক হালি

কলা নিয়ে এল বানরের জন্য। যথারীতি খেলা শুরু হলে লোকটি কলা নিয়ে বানরের সামনে যেতেই, বানর কলাগুলো নিয়ে একটি কলা ছিলে ঘাঁড় বাঁকা করে কলার দিকে তাকিয়ে রইল। বানর কলা খাচ্ছে না। উপস্থিত দর্শক জিজ্ঞেস করলেন বিষয় কী ভাই! কলা তো বানরের পছন্দের খাবার। কলা খাচ্ছে না কেন? লোকটি বলল, কলায় এত পরিমাণে ফরমালিন মেশানো আছে যে বানর নাকের কাছে নিতেই টের পেয়ে গেছে এটাতে ফরমালিন মেশানো আছে।

তাহলে আপনার বানর কী খায়? আপনি কী খাওয়ান? লোকটি বলল, ওর খাবারের অভাব নেই। আজ তার সাপ্তাহিক ছুটি তাই তাকে বেড়াতে নিয়ে এসেছি, দু দিন মনের আনন্দে খেলা করছি। ও একটি বাজারে নিয়মিত ডিউটি করে। একটি মজার ঘটনা বলি মন দিয়ে শুনুন। ওকে নিয়ে একদিন নালিতাবাড়ী হাটে প্রবেশ করি এবং কলার বাজারে ঘুরাঘুরি করি। সে তার পছন্দের দোকানগুলোতে দাঁড়িয়ে যায়। ফরমালিনমুক্ত কলার দিকে তাকিয়ে থাকে। সে নিজেই হাত দিয়ে দেখিয়ে দেয়, ওখান থেকে তাকে কলা কিনে দেই। উক্ত ঘটনা দুই-চারদিনেই বেশ প্রচার হয়ে যায়। মানুষে বলাবলি করছে যে নালিতাবাড়ী বাজারে এক বানর এসেছে, ভেজাল কলা খায় না। তাই দেখে সম্মানিত ক্রেতাগণ যে দোকানের কলা বানর খায়, ঠিক সেই দোকানের কলা কিনতে ভিড় জমায়। লাইন ধরে অপেক্ষা করে কলা কেনার জন্য। একদিন দুইদিন তিনদিন এরকম চলতে চলতে আশপাশের দোকানের বিষযুক্ত কলা বিক্রি হয় না। অসৎ কলার দোকানিদের ব্যবসায় ধস নেমে আসল। এসব বুঝতে পেরে সৎ কলা দোকানিকে চাপ প্রয়োগ করতে লাগলেঅ। সাথে সাথে আমাকেও ধমক দিতে লাগল। তুমি এই বাজার থেকে চলে যাও, তোমার আর তোমার বানরের জন্য আমরা পথে বসে যাচ্ছি। শুধু তাই নয় আমাকে অসৎ দেকানিরা কিছু টাকাও পকেটে ভরে দেয়, টাকা দেওয়ার ঘটনাটি বানরের নজরে আসলে সে আমার সাথে অভিমান করে। প্রায় তিনদিন কিছু খায়নি। বাড়িতেও সবার সাথে খারাপ আচরণ করে। লুঙ্গি ধরে আমাকে টানতে টানতে নিয়ে যায় সেই অসৎ দোকানিদের কাছে। সে নিজেই আমার পকেট থেকে টাকাগুলো নিয়ে দোকানের ভেতরে ছুড়ে মারে। আমি ভীষণ লজ্জিত হলাম বানর কান্না করছে। সব টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার পর বানর আমার গলা ধরে ঘাড়ে মাথা রেখে সম্মান করতে লাগল, আমিও তার পিঠে হাত দিয়ে আদর করতে লাগলাম এবং তার সততার জন্য নিজেও অশ্রুসিক্ত হলাম। একজন মানবিক পুলিশ, ঘটনাটি শুনে প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে বিস্তারিত খুলে বললেন। পরদিন অফিসারগণ, মেয়র মহোদয়সহ সেই কলার হাটে উপস্থিত হলেন। হাজার হাজার মানুষ সেখানে জড়ো হলেন। পুলিশের বড়ো অফিসার উপস্থিত জনতার কাছে জানতে চাইলেন, এই বানরের জন্য আপনাদের উপকার হচ্ছে না অপকার হচ্ছে। সবাই একসাথে উচ্চস্বরে বললেন স্যার, এই বানর আমাদের দরকার, বাজার মনিটরিংয়ের জন্য।

অফিসার তখন দোকানিদের উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন, তোমাদের অনেক নিষেধ করেছি তোমরা মানুষের পেটে বিষ ঢুকিয়ে দিও না! তোমরা শুনোনি? আমরাও নিত্যদিন তোমাদের ফল সবজি চেক করতে পারি না। উপস্থিত জনগণের উদ্দেশ্যে বললেন, আজ থেকে আপনারা মনে রাখবেন এই বানর যেই দোকানের কলা খাবে আপনারা সেই দোকানের কলা কিনবেন। সাথে সাথে আরো একটি ঘোষণা দিলেন। 'আপনারা মাসে একটা বেতন বানরের মালিককে দিবেন সবাই মিলে, আমরা প্রশাসন থেকে তার জন্য কিছু ব্যবস্থা করব'। অসৎ কলা দোকানিরা চিন্তায় পড়ে গেল,তারপর সবাই সিদ্ধান্ত নিলো তারাও ফরমালিনমুক্ত কলা দোকানে বিক্রি করবেন। ধীরে ধীরে সবাই ফরমালিনমুক্ত কলা দোকানে বিক্রি করতে লাগলেন। আমিও আমার বানরকে খুব যত্ন করে দোকানে নিয়ে কলা খাওয়াতে থাকলাম। ধীরে ধীরে বানর প্রায় সব দোকানে কলা খাওয়া শুরু করল। সকল ক্রেতা ওই সব দোকান থেকে অনায়াসে কলা কিনতে লাগল। এখন শুধু কলা নয় সকল প্রকার ফলমূল, সবজি নির্ভেজাল। বেচা-কেনা অনেক বেশি। ক্রেতা-বিক্রেতা প্রশাসন মিলে আমাকে যে পরিমাণ অর্থ দেয়, আমি রাজার হালে চলি, আর এই সবটুকু কৃতিত্বই আমার বানরের সততা। ❐

গল্পকার

অনুবাদ গল্প

দুষ্টু খরগোশের গল্প

খায়রুল আলম রাজু

অনেক দিন আগের কথা। চারটি ছোটো খরগোশ তাদের মায়ের সাথে নদীর তীরে একটি বড়ো দেবদারু গাছের শিকড়ের নিচে থাকত। তাদের নাম ছিল- ফ্লপসি, মোপসি, কটন-টেল এবং পিটার।

একদিন এক ঝলমলে সুন্দর সকালে তাদের মা বললেন, 'প্রিয় ছানারা, এদিকে এসো, আমার কথা শুনে যাও। তোমরা সবুজ মাঠে কিংবা ধানক্ষেতে খেলতে যেতে পারো। চাইলে নদীর তীরেও খেলতে পারো। কিন্তু সাবধান, তোমরা কেউ ভুল করেও মিস্টার ম্যাকগ্রেগরের বাগানে যাবে না। কেননা তোমাদের বাবা সেখানে এক দুর্ঘটনায় পড়েছিলেন; আর শেষ বারের জন্য আমায় তাকে বিদায় জানাতে হয়েছিল'।

ছোটো খরগোশ ছানারা মায়ের কথায় মাথা নেড়ে সায় দিল। মা তাদের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বললেন,

'যাও, তোমরা এখন খেলা করো, তবে দুষ্টুমি না। আমি বাজারে যাচ্ছি।'

মা খরগোশ একটি ঝুড়ি এবং তার ছাতা নিয়ে বাজারের দিকে এগিয়ে

গেলেন। বাজারে তিনি কিছু বাদামি রুটির সাথে পাঁচটি কিসমিস বান কিনেছিলেন।

ফ্লপসি, মোপসি এবং কটন-টেল, তারা ছিল খুব ভালো, খরগোশ ছানা। তারা তাদের মায়ের কথা মেনে চলত। তাই তারা ব্ল্যাকবেরি সংগ্রহ করতে বনের পথে নেমেছিল; কিন্তু পিটার, যে খুব দুষ্টু ছিল, সে সোজা মি. ম্যাকগ্রেগরের বাগানের দিকে দৌড়ে গেল। আর সেখানেই সে আটকা পড়ে গেল! কিন্তু ওদিকে তার কোনো খেয়ালই ছিল না। সে বাগানে এসেই দূর থেকে টকটকে লাল গাজর দেখতে পেল।

প্রথমে সে কিছু লেটুস এবং কিছু ফ্রেঞ্চ বিন খেয়ে নিল; তারপর সে কিছু মুলা খেয়েছিল; যা ছিল ধবধবে সাদা এবং খুবই সুস্বাদু।

এত এত ফল ও সবজি খাবার পর পিটার অসুস্থ বোধ করল, সে একটি বড়ো গাছের নিচে একটু জিরিয়ে নিলো। পিটার ভাবতে শুরু করল এবং মনে মনে বলল, 'এত বড়ো একটা বাগানে সে একা!'

এমন সময় পিটারের মনে হলো মিস্টার ম্যাকগ্রেগরের কথা। সে নিজেই নিজেকে বলল, 'সবুজ হলুদ পাকা ফল, টাটকা সবজির এই সুন্দর গোলাকার বাগানের প্রান্তে, মিস্টার ম্যাকগ্রেগর ছাড়া আর কেউ নেই!'

মিস্টার ম্যাকগ্রেগর তখন নিজ হাতে কচি বাঁধাকপি রোপণ করছিলেন, এমন সময় পিটার লাফিয়ে লাফিয়ে তার পিছনের দিকে দৌড়ে গেল, ঠিক তখন তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন আর বললেন, 'চোর চোর চোর, থামো বলছি, থামো!'

পিটার ভীষণ ভয়ংকরভাবে ভীতু বনে গেল ; সে বাগানের এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতে লাগল, কেননা সে ফেরার পথ ভুলে গিয়েছিল।

এদিক ওদিক ছোটাছুটি করার সময় সে তার একটি জুতা বাঁধাকপির ক্ষেতে এবং অন্য জুতাটি আলু ক্ষেতের মধ্যে হারিয়ে ফেলেছে।

জুতো হারানোর পরে, সে খালি পায়ে এদিক-ওদিক অনেক দৌড়ে ছিল। পিটার পালানোর অনেক চেষ্টা করেছিল। দৌড়াতে দৌড়াতে সে গুজবেরি জালের দিকে গেল। কিন্তু সে কোথাও পালাতে পারল না। দুর্ভাগ্যবশত সেই গুজবেরি জালে সে আটকা পড়ল।

পিটার দ্রুত পালিয়ে যেতে পারত। সে তার পরনে থাকা জ্যাকেটের বোতামের জন্য আটকা পড়ে, যা ছিল পিতলের নীল রঙের বেশ নতুন বোতাম।

পিটার নিজের মুক্তির জন্য অনেক চেষ্টা করছিল, সাহায্যের জন্য ভীষণ কাঁদছিল; কিছু দয়ালু চড়ুই পাখিরা তার কান্না শুনেছিল, তারা তার কাছে এসে নিজেকেই একটা উপায় বের করার পরামর্শ দিলো।

কিছু সময় পর মিস্টার ম্যাকগ্রেগর একটি চালুনি নিয়ে এসেছিলেন, যা দিয়ে তিনি পিটারকে ধরার চেষ্টা করেছিলেন; এমন সময় পিটার গুজবেরি জাল থেকে বেরিয়ে গেল, কিন্তু তার জ্যাকেটটি সেখানেই জালে আটকে রইল।

ক্লান্ত দেহে সে একটি ঘরের দিকে ছুটে গেল। সেখানে সে একটি পানির পাত্র দেখতে পেল। সে পাত্রটি উলটিয়ে পানি ঢেলে তার ভিতরে লুকিয়ে পড়ল। মিস্টার ম্যাকগ্রেগর নিশ্চিত ছিলেন যে পিটার ঘরটার ভিতরে লুকিয়ে আছে। সম্ভবত খরগোশটি (পিটার) পানির পাত্রের নীচে লুকিয়ে আছে। তাই তিনি সাবধানে সবকটি পাত্র উলটাতে শুরু করলেন।

পিটার তার এমন কাণ্ডে ভয় পেল আর পাত্র থেকে বেরিয়ে দৌঁড়াতে শুরু করল। মিস্টার ম্যাকগ্রেগর কিছুক্ষণের মধ্যেই তার পিছু নিলেন এবং পিটারকে ধরার অনেক চেষ্টা করলেন। পিটার তখন তার ছোটো শরীর নিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। তিনিও তার সাথে লাফ দিয়ে তিনটি গাছপালা ভেঙে দিয়েছিলেন। কেননা মিস্টার ম্যাকগ্রেগরের জন্য জানালাটি খুব ছোটো ছিল। দুষ্টু পিটার নামের খরগোশ তার এমন কাণ্ড দেখছিল- আর ঘন ঝোপের ভেতর থেকে মনে মনে হাসছিল। তার পিছনে দৌড়াতে দৌড়াতে মিস্টার ম্যাকগ্রেগর ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। অত:পর তিনি তার কাজে ফিরে গেলেন।

মিস্টার ম্যাকগ্রেগরের হাত থেকে বেঁচে পিটার এক ঘন সবুজ ঝোপের মধ্যে এসে পড়ল। সে বড়ো বড়ো নিশ্বাস নিচ্ছিল এবং ভয়ে কাঁপছিল। বাড়ি ফেরার উপায় কিংবা কোন পথে ফিরতে হবে সে তার কিছুই চিনতে পারছে না।

কিছুক্ষণ পর সে এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করতে লাগল। একবার ডানদিকে, একবার বামদিকে, সামনে-পিছনে, বার বার এবং চারিদিকে তাকাতে লাগল।

এভাবে অনেক পরে সে একটি দেয়ালে একটি দরজা খুঁজে পেল; কিন্তু তাও ছিল তালাবদ্ধ, আর তার নীচ দিয়ে যাবার মতো কোনো জায়গাও ছিল না।

এমন সময় পিটার দেখতে পায় একটি বুড়ো ইঁদুর পাথরের দরজার উপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে, সে তার মুখে করে তার পরিবারের জন্য মটর কিংবা মটরশুটি জাতীয় খাবার নিয়ে যাচ্ছিল। পিটার তাকে গেটের পথ জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু তার মুখে এত বড়ো মটর ছিল যে সে পিটারের উত্তর দিতে পারেনি। বুড়ো ইঁদুর শুধু তার দিকে চেয়ে মাথা নাড়ল। পিটারের মায়ের কথা ও তার ভাইবোনদের কথা খুব মনে পড়ল। সে কাঁদতে লাগল।

খানিকক্ষণ পর পিটার কান্না থামিয়ে নিজেকে শান্ত করল।

তারপর সে সোজা বাগানের ওপারে যাবার পথ খুঁজতে শুরু করল। অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর পিটার শেষ পর্যন্ত বাগানের বাইরে আসার নিরাপদ পথ খুঁজে পেল।

বাগানের বাইরে এসে পিটার দেখল,

মিস্টার ম্যাকগ্রেগর কাক পাখিদের ভয় দেখানোর জন্য বাগানের মাঝখানে তার ফেলে আসা জ্যাকেট এবং জুতো দিয়ে কাকতাড়ুয়া বানিয়েছেন।

পিটার না থেমে এক দৌড়ে দেবদারু গাছের কাছে তাদের বাসায় পৌঁছেছে।

এতে সে ভীষণ ক্লান্ত এবং অসুস্থ হয়ে পড়েছিল।

তার মা তাকে বকাঝকা করলেন এবং বললেন, 'পিটার, দিন দিন তুমি বড্ড দুষ্টু হয়েছ। তোমার জামাকাপড় আর জুতো জোড়া কই?'

মনে রেখো, এক সপ্তাহে এই নিয়ে তুমি দ্বিতীয়বার তোমার জ্যাকেট এবং জুতো হারিয়েছ! বলতে বলতে মা তাকে বিছানায় শুইয়ে দিলেন এবং কিছু ক্যামোমিল চা বানিয়ে দিলেন এবং তিনি পিটারকে সেখান থেকে এক চামচ খেতে দিলেন! আর বললেন, 'শুতে যাওয়ার সময় পুরোটা খেতে হবে।' কিন্তু ফ্লপসি, মোপসি, এবং কটন-টেলের রাতের খাবারে ছিল বাদামি রুটি, দুধ এবং ব্ল্যাকবেরি, হয়ত আরো আছে। ❐

মূল লেখক : বিয়াট্রিক্স পটার

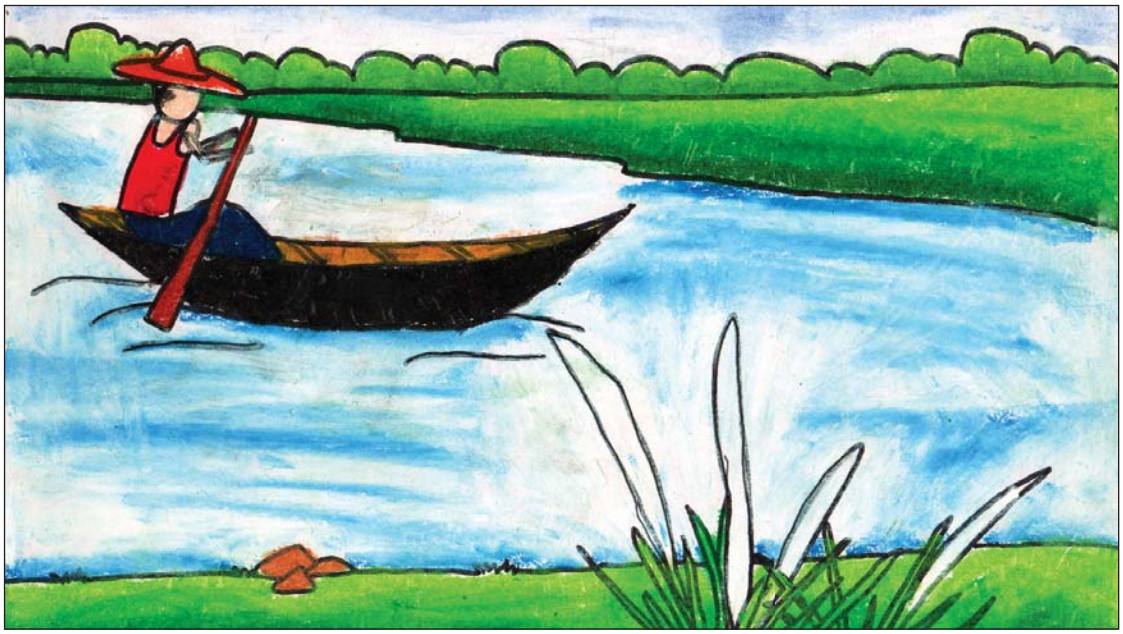

মীর্জা মাহের আসেফ, তৃতীয় শ্রেণি, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা

শরৎ

বোরহান মাসুদ

শরৎ এসে রংধনুতে সাজলো আকাশ
নদীর কূলে কাশের ফুলে হাসলো বাতাস।
শীতল শীতল মনটা কেমন হাওয়ায় মাখে
রোদের ঝিলিক চমকে ওঠে মেঘের ফাঁকে।

শুভ্র সকাল শিশির ভেজা কচি ঘাসে
স্বর্ণমাখা সূর্য এসে মিষ্টি হাসে।
ব্যস্ত কৃষক ফসল ফলায় ধানের মাঠে
খোকন সোনার মন বসে না বইয়ের পাঠে।

এই শরতে সুখ খুঁজে পাই পাখির মনে
দুঃখ ভুলে একলা বেড়াই সবুজ বনে।
শরৎ আহা, কী অপরূপ হৃদয়খোলা
সকাল-বিকাল মনের ভেতর দেয় যে দোলা।

ঢেউ খেলে যায় রং-বেরঙের ফুলের বাহার
তার উপরে শরৎ বানায় রঙিন পাহাড়।
সেই পাহাড়ে ঘুরতে থাকি সারা বেলায়
ঘুরে ঘুরে উড়ে বেড়াই শরৎ খেলায়।

শরৎকাল

শাহজাহান মোহাম্মদ

নীল আকাশের মুচকি হাসি
শরৎ এলো বলে
ঝিকিমিকি কাঁচা রোদ
নাচে পুকুর জলে।

ঝিরিঝিরি হাওয়া এসে
দোলায় মায়ের মন
শরৎ রানী সাদা মেঘে
উড়ছে সারাক্ষণ।

পুকুর পাড়ে নদীর ধারে
কাশফুলের মেলা
সেই খুশিতে জলকেলিতে
পাতি হাঁসের খেলা।

ঘোমটা মাথায় গাঁয়ের বধূ
শিশির ভেজা পায়
ভোর বিহানে শিউলি বকুল
মালা গেঁথে যায়।

পাশলা-শালুক পদ্ম বিলে
ডাকছে ইশারায়
পাকা তালের রসের পিঠা
কে কে খাবি আয়।

শরতের আগমন

এস এম মাসুদ

বর্ষা ঋতুর পর শরতের আগমন ঘটে
নতুন রুপ ধরে!
ধূসর সাদা কাশফুলের দেখা মেলে
গহীন বালু চরে!
শিউলি, কামিনী, মাধবী আর মল্লিকারা
শরতের বার্তা নিয়ে ফোঁটে!
সবুজে ঘেরা ফসলের মাঠ দেখে কৃষকের মন
আনন্দে ভরে ওঠে!
খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘের ভেলকি যেন
নীল আকাশে ভাসে!
বিল-ঝিলেতে ডুবে থাকা শালুক ফুল
মাথা তুলে হাসে!
দুর্বাঘাসে শিশির কণা রোদের আলোয়
করে জ্বলজ্বল!
আকাশ পানে সারি বেধে উড়ে বেড়ায়
সাদা বকের দল!

আজ সারাদিন

ওমর ফারুক নাজমুল

হিজল ফুলের গন্ধ শুঁকে পথ হারিয়ে যাই
এই সারাদিন একলা মাঠে নাওয়া-খাওয়া নাই,
কী আর করি পাই না ভেবে ফড়িং হলো সাথি
আমায় নিয়ে সবুজ মাঠে করছে মাতামাতি।
প্রজাপতির গল্প শুনে উদাস আমার মন
বুনো পাহাড় ডেকে ডেকে ক্লান্ত সারাক্ষণ,
রিসাং ঝিরি রিসাং ঝিরি তাহার বুকে চলা
ফিরলে বাড়ি মা দেবেন আজ কসিয়ে কানমলা।
অঙ্ক স্যারের সৃজনশীল ভুলেই গেছি শেষে
আজ সারাদিন কাটিয়ে দিলাম মেঘ পাহাড়ের দেশে,
ইশ! মুড়কি মোয়া মিস, ঘুমিয়ে মা ঘরে
ডাহুক ডাকা রাত্রি নামে মনটা কেমন করে।
ঘুম আসে না পড়ার ঘরে ভাবনাতে দিই ডুব
মনে পড়ে শান্ত বিকেল শ্যাওলা নদী খুব।

গল্প

টিংটুকুর লাল মাছ

জসিম উদ্দিন জয়

লাল জামা আর লাল জুতা পরে হেঁটে যাচ্ছে টিংটুকুর। সাথে কানে হেডফোন লাগিয়ে তিড়িংবিড়িং নাচের তালে হাঁটছে দুক্কু। সমুদ্রের স্বচ্ছ নীল পানির নিচে হঠাৎ একটি লাল মাছ ভেসে উঠতে দেখে আনন্দে লাফিয়ে উঠে দুক্কু ও টিংটুকুর। মাছটি দেখতে তাদের জামা ও জুতার রং এর মতো। দুক্কু পানিতে ঝাঁপিয়ে পরে মাছটিকে খপ করে ধরে ফেলে। টিংটুকু কটুদৃষ্টিতে দুক্কুর দিকে তাকিয়ে রেগে গিয়ে বলে 'মাছটিকে ধরেছো কেন? ছেড়ে দাও বলছি, ও ব্যথা পাবে মারা যাবে।

দুক্কু তখন টিংটুকুর দিকে তাকিয়ে হেসে উঠে বলে, আমি ওকে বাচাঁনোর জন্যই ধরেছি, দেখতে পাচ্ছো না। ও পানিতে অক্সিজেন পাচ্ছে না, শীঘ্রই চলো ওকে অন্য পানিতে নিতে হবে'। যেমন কথা তেমন কাজ।

একটি বড়ো খাবার পানির বোতলে মাছটিকে ডুবিয়ে রাখল। মাছটি সতেজ হয়ে উঠে। দুক্কু এখন টিংটুকুর দিকে ভারাক্রান্ত মনে তাকিয়ে বলে, 'গভীর সমুদ্রের নিচে পারমাণবিক বোমা ফাটিয়েছে দুষ্টু লোকের দল, ওরা জানে না সেখানে ভূমির কয়েকটি প্লেটের সংযোগস্থল'

বলেই থেমে যায় দুক্কু। কিছুক্ষণ চুপ থেকে চিৎকার করে বলে উঠে সে, টিংটুকু! সমুদ্রের পাড় থেকে সব মানুষকে চলে যেতে বলো। এখানে কিছুক্ষণের মধ্যেই পোতাশ্রয়ের ঢেউ অর্থাৎ শক্তিশালী জলোচ্ছ্বাস হবে। টিংটুকু বিশ্বাস করে দুক্কু যা বলে তাই ঘটে, সে তড়িঘড়ি করে সবাইকে হ্যান্ডমাইক দিয়ে চিৎকার করে বলছে 'তোমরা এখান থেকে চলে যাও'। কে শুনে এই ছোটো শিশুটির কথা, কেউ কেউ তাদের দেখে ভেংচি কাটছে। দুক্কু দেখতে কুকুরের মতো তাছাড়া দুক্কুর ভাষা টিংটুকু ছাড়া কেউ বোঝে না। তাই যা হবার তাই হলো। কেউ কেউ তাদের কথা শুনেছে, অনেকেই তাদের ধমক দিয়ে থামিয়ে দিচ্ছে। দ্রুতগতিতে টিংটুকুর

ও দুক্কু লাল মাছটি একটি পাত্রের মাঝে নিয়ে বাড়িতে ফেরে। তখন পড়ন্ত বিকেল। তারা লাল মাছটিকে একটি বড়ো অ্যাকুরিয়ামের ভেতর ছেড়ে দেয়। লাল মাছটিকে খাবার খেতে দেয় টিংটুকুর। তখন রাত। টিংটুকুর নিজ কণ্ঠে মাছটিকে গান শোনাচ্ছে সাথে দুক্কু হাততালি দিয়ে সুর মেলাচ্ছে। গান গাইতে গাইতে টিংটুকু ঘুমিয়ে পড়ে।

হঠাৎ মাছটি কথা বলে উঠে, 'টিংটুকুর, তুমি কি আমার বাচ্চাকাচ্চার খবর নিতে পারবে? তারা বেঁচে আছে কি না? টিংটুকু খানিকটা চিন্তিত হলো পরে মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলে, 'এক্ষুনিই খবর নিচ্ছি, দুক্কুর দিকে তাকিয়ে আদেশ করে, দুক্কু এক্ষুনিই যাও লাল মাছটির বাচ্চাকাচ্চাদের এই বিপদ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসো এখানে'।

দুক্কু কোনো কিছু বোঝার আগেই বেরিয়ে যায় টিংটুকুর আদেশ পালন করার জন্য। তখন গভীর রাত পেরিয়ে ভোরের দিকে। ভোরের আজান হলো। দুক্কুর হাউমাউ কান্নার শব্দে ঘুম ভাঙে টিংটুকুর। দুক্কু কান্নারসুরে টিংটুকুর দিকে তাকিয়ে বলে উঠে, লাল মাছটির পরিবারের সবাই মারা গিয়েছে। তখন সকাল। ততক্ষণে টিংটুকুর বাড়ির চারপাশে লোকজনের ভিড় জমে গেছে। সবাই টিংটুকুকে সাব্বাস ! সাব্বাস ! বলে বাহাবা দিচ্ছে, আর বলছে 'তোমার জন্যই আমরা বেঁচে গেছি। যারা তোমার কথা শুনেছে তারা সবাই বেঁচে গেছে। সেখানে ভয়ংকর পোতাশ্রয়ের ঢেউ হয়েছিল, অনেক লোক মারা গেছে কিন্তু আমরা তোমার কথা শুনে সবাই বেঁচে গেছি'। এর মধ্যে সরকারি লোকজন, মিডিয়া সব ভরে গেছে। সরকার সবচেয়ে বড়ো পুরস্কার দিল টিংটুকুকে। টিংটুকু আনন্দে হেসে উঠে দুক্কুর দিকে তাকায়। দুক্কু অ্যাডভান্স কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার রোবট, যার কারণেই এটা সম্ভব হয়েছে। দুক্কু কোনো কিছুর নমুনা দেখে মেশিনের মাধ্যমে লার্নিং করতে পারে। টিংটুকু পুরস্কারটি দুক্কুর হাতে উঠিয়ে দেয়। দুক্কু পুরস্কারটি জাতীয় জাদুঘরে পাঠিয়ে দেয়। পুরস্কারটি দেখে সবাই ঘটনা জানবে এবং এই ঘটনাটি থেকে সবাই যেন শিক্ষা পায় ছোটো বলে কাউকে অবহেলা করতে নেই। ❐

গল্পকার

কাগজের কলম

সালাউদ্দিন রেজা

গাছের প্রাণ আছ এই কথা তো জগদীশ চন্দ্র বসু বহুকাল আগেই প্রমাণ করে গিয়েছেন। এই গাছের প্রাণ যদি কলমে ছড়িয়ে দেওয়া যায়, তাহলে কেমন হয় বলো তো বন্ধুরা ? এই কাগজের কলম কেবল খাতায় লেখা ফোটায় না, প্রকৃতিতে ফোটায় ফুল। এই কলমে জড়িয়ে আছে প্রাণ। তাই একে 'গ্রিন পেন'ও ডাকা হয়। সবুজ প্রকৃতির মধ্যে আরো এক চিমটে সবুজের ছোঁয়া ছড়িয়ে দিতেই নেওয়া হয়েছে কাগজ দিয়ে তৈরি পরিবেশবান্ধব কলম তৈরির এক ভিন্নধর্মী উদ্যোগ। আর এর প্রেক্ষাপটে রয়েছেন সঞ্জয় চৌধুরী।

সবুজের লড়াইয়ে সঞ্জয় চৌধুরী একজন পরিবেশবাদী। পড়াশোনাও করেছেন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশবিজ্ঞান বিভাগে। সেই লক্ষ্যে ২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠা করেছেন পরিবেশবাদী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গ্রিন ইকো। পরিবেশের প্রতি ভালোবাসাই নয়, সুস্থ পরিবেশ তৈরির দায়বদ্ধতা থেকেই কাগজের কলম তৈরির উদ্যোগ নিয়েছেন তারা।

বাহ্যিক অংশে ব্যবহার করা হয় কাগজ। ভেতরের রিফিল অংশে প্লাস্টিকের রিফিল কলমের মতোই শিষ জুড়ে দেওয়া হয়। কাগজকে কলমের আকারে জোড়া লাগানোর জন্য ব্যবহার করা হয় গাম বা আঠা। কাগজকে হাতের সাহায্যে প্যাঁচিয়ে সেখানে আঠা ব্যবহার করা হয়। এই আঠা-ই মূলত কলমের মূল ভিত্তি। আঠার কারণেই কলমের ভিত শক্ত হয়। কলমের শেষ অংশে বীজ যুক্ত করে কলমকে মুড়িয়ে দেওয়া হয়। বীজের মধ্যে থাকে তুলসি, বেগুন, মরিচ, টমেটো, অপরাজিতা প্রভৃতি বীজ। ঋতু অনুযায়ী যখন যার ফলন ভালো হয় সেগুলোই কলমের সাথে সংযুক্ত করার চেষ্টা থাকে। কলমের কালি ফুরিয়ে গেলে কেউ চাইলেই কাগজ থেকে বীজ বের করে মাটিতে বা টবে রোপণ করে দিতে পারবে।

আরো সহজভাবে বলতে গেলে কেউ যদি চায় তাহলে কাগজের মধ্যে বীজ রেখেই মাটিতে রোপণ করে দিতে পারবে। নিয়মিত পানির সংস্পর্শে এলে বীজ অঙ্কুরিত হবে এবং একসময় কাগজও মাটির সাথে মিশে যাবে। প্লাস্টিকের কলমের মতো কাগজের কলমকেও ঢেকে রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে কাগজের ক্যাপ বা ঢাকনা। তবে এই কলম ব্যবহারে কিছুটা সচেতন থাকতে হয়। দুমড়ে-মুচড়ে ব্যবহার না করে যত্ন নিয়ে ব্যবহার করলে এই কলম টেকে বহুদিন। তবে বৃষ্টির সময় যদি কলম টানা আধাঘণ্টা পানিতে ভিজতে থাকে- সেক্ষেত্রে ক্ষতি হবে।

বর্তমানে প্রতি বছর ৪৩৮ মিলিয়নের মতো প্লাস্টিক উৎপাদিত হয়। অনুমান করা হচ্ছে, এভাবে প্লাস্টিকের ব্যবহার চলতে থাকলে ২০৫০ সালের মধ্যে এই মাত্রা ৩৪ বিলিয়ন টনে উন্নীত হবে। পরিবেশের জন্য অন্যতম ক্ষতিকর বস্তু হলো প্লাস্টিক। কলমের ক্ষেত্রেই সাধারণত প্লাস্টিক বেশি দেখা যায়। তাই কলম তৈরিতে প্লাস্টিকের পরিবর্তে কাগজের ব্যবহার শুরু করেছে গ্রিন ইকো। যা একদিক থেকে প্লাস্টিকের ব্যবহার কমাবে, পাশাপাশি পরিবেশবান্ধব অর্থনীতি বির্নিমিত করবে- এমনটাই বিশ্বাস প্রতিষ্ঠাতা সঞ্জয় চৌধুরীর। শুধু কাগজের তৈরি কলমই নয়, এর সাথে কলমের নিচের অংশে যুক্ত গাছের বীজ। প্রকৃতিতে নতুন প্রাণ সৃষ্টির সহায়ক হবে। ২০২৩ সালের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে- 'প্লাস্টিক দূষণ সমাধানে সামিল হই সকলে'। প্লাস্টিক এড়িয়ে কাগজের কলম ছড়িয়ে দেওয়ার রণে কাগজের কলম যোদ্ধা। লক্ষ্য এখন শুধু একটাই- সবুজ পরিবেশ বিনির্মাণ করে প্রজন্মের জন্য নতুন পৃথিবী তৈরি করা। ❐

প্রাবন্ধিক

শরৎ

রকিবুল ইসলাম

তুলো তুলো
মেঘগুলো
নীলাকাশে ভাসছে
কাশফুল
নদীকূল
এলোমেলো হাসছে।
ভালোবাসি
রাশি রাশি
শিশিরের মুক্তা
মন বুঝি
পেলো খুঁজি
শরতের মুখটা।

শরৎ এল

মেশকাউল জান্নাত

রৌদ্র হাওয়া মেতেছে
লুকোচুরি খেলায়
শরৎ এল সবার কাছে
আকাশে মেঘের ভেলায়।

নদীর পাড় উঠল সেজে
ডগায় ডগায় কাশফুল
তারই সাথে খালেবিলে
উঠল জেগে শাপলা ফুল।

নবম শ্রেণি, খিলগাঁও মডেল হাই স্কুল, ঢাকা

শরতের কবিতা

মো. মুশফিকুর রহমান (মিদুল)

বর্ষা রানির পথ ধরে
শরৎ বাবু আসে
শিশির কণা ছিটিয়ে যায়
সবুজ শ্যামল ঘাসে।

নীল আকাশটাও ফরসা থাকে
চোখ জুড়ানো নীলে
শাপলারাও হাসতে থাকে
দিঘি কিংবা বিলে।

বর্ষা পাড়ি জমায় দেশে
শরৎ করে মানা
আর কয়টা দিন থাকো
কাছে আসবে হেমন্ত নানা।
এইভাবেই ঘুরে বেড়ায়
ছয় ঋতুরই ছানা
আসবে শরৎ যাবে শরৎ
নেই যে কোনো মানা।

দশম শ্রেণি, মহানগর আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মুগদা

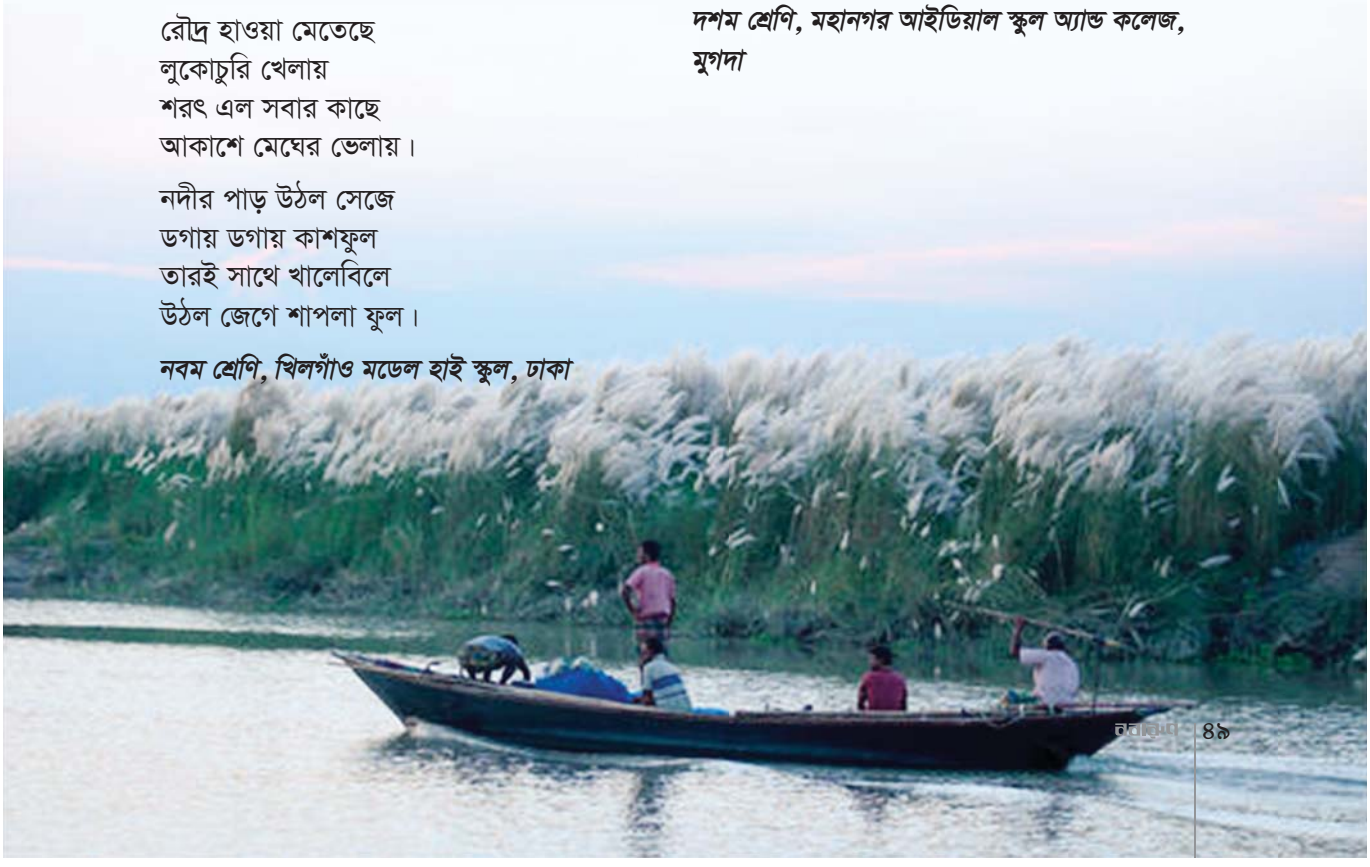

শরতের লুকোচুরি

আনিকা বিনতে মাহবুব

শরৎ এলে সকাল হাসে
নীলাকাশে শুভ্র মেঘের ঢং
পদ্ম ফুলের পাতায় পাতায়
নানান রকম রং।

শান্ত নদীর কোলে
কাশফুলেরা দোলে
গাছে পাকা তাল
উড়ায় মাঝি পাল।

আকাশ জুড়ে ঘুড়ির মেলা
ঘাসের ডগায় শিশির খেলা
মেঘ বালিকার লুকোচুরি
রোদ চলে তার পিছু পিছু।

একাদশ শ্রেণি,
সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ,
টিকাটুলি

তালের পিঠা

মিহির হোসেন

ভাদ্র মাসের তালের পিঠা
খেতে লাগে বেশ
নানা রঙের পিঠার গন্ধে
মনে জাগে খুশির আমেজ।

একসাথে সবাই মিলে
মজার পিঠাগুলো খাই
মায়ের হাতে তৈরি পিঠার
কোনো তুলনা নাই।

নবম শ্রেণি,
মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়,
মিরপুর

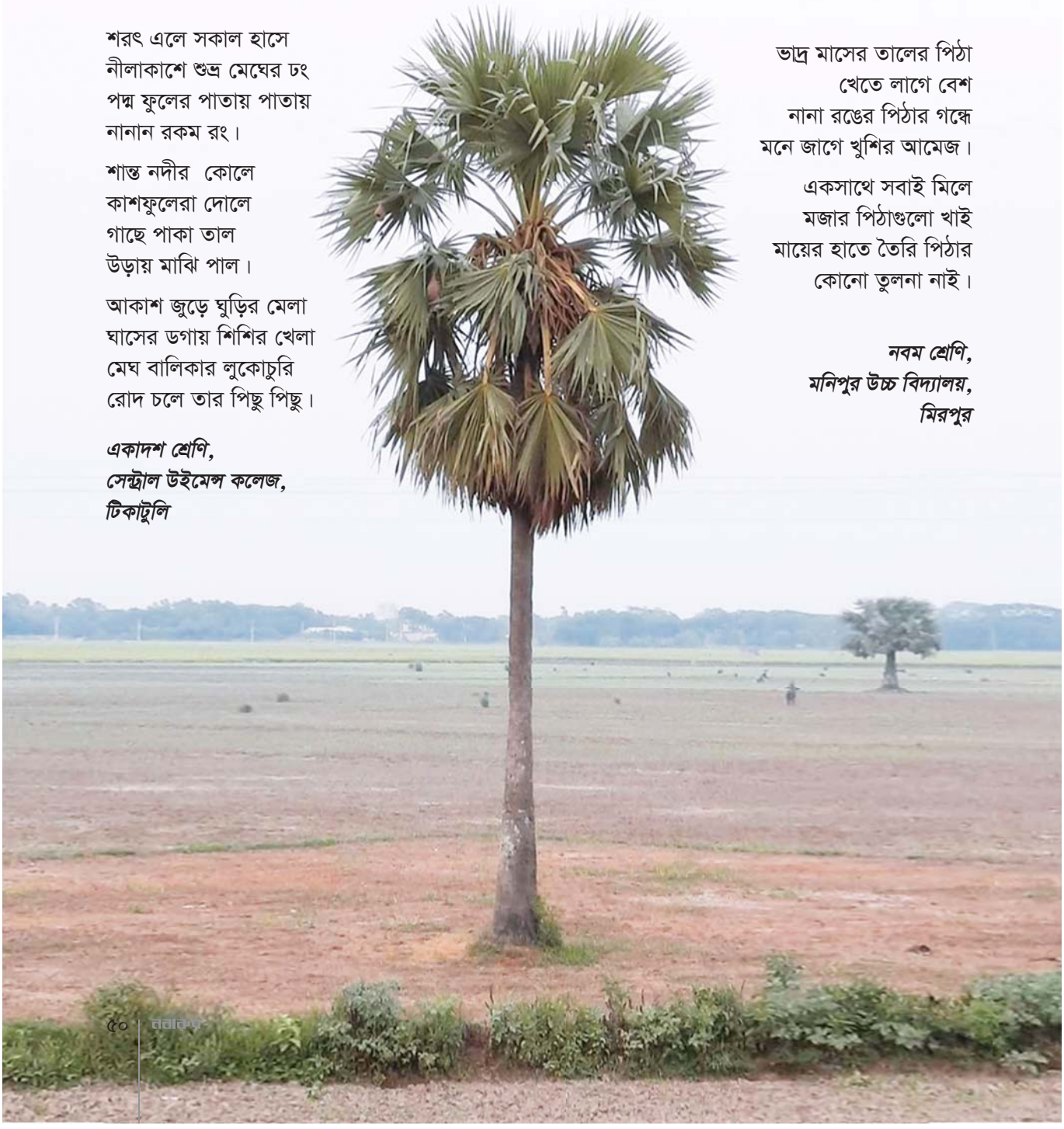

বিশ্বকাপে বাংলাদেশের প্রথম আম্পায়ার

আগামী ৫ই অক্টোবর ভারতে শুরু হচ্ছে ওয়ানডে ক্রিকেট বিশ্বকাপ। বিশ্বকাপের এই আসরে প্রথমবারের মতো দায়িত্ব পালন করবেন বাংলাদেশের আম্পায়ার শরফুদ্দৌলা ইবনে শহিদ সৈকত। গত ৮ই সেপ্টেম্বর ম্যাচ অফিসিয়ালদের এই তালিকা প্রকাশ করে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)। এর আগে তিনি এ বছর নিউজিল্যান্ডে মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপে আম্পায়ারের দায়িত্ব পালন করেছেন। সম্প্রতি প্রথমবারের মতো নিরপেক্ষ আম্পায়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন আফগানিস্তান-পাকিস্তান সিরিজেও।

২০১০ সালে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আম্পায়ারিং-এ অভিষিক্ত হন শরফুদ্দৌলা। এরপর ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে ওয়ানডে ফরম্যাটের ক্রিকেটে ম্যাচ পরিচালনার পথচলা শুরু। ২০২৩ সালের এপ্রিলে দ্বিতীয় বাংলাদেশের আম্পায়ার হিসেবে জায়গা করে নেন আইসিসির ইমার্জিং আম্পায়ার প্যানেলে। তারই ধারাবাহিকতায় এবারে বিশ্বকাপের মঞ্চে ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্ব পেলেন তিনি।

শরফুদ্দৌলা ইবনে শহিদ সৈকত ছাড়াও বিশ্বকাপে যে-সকল আম্পায়ার দায়িত্ব পালন করবেন তারা হলেন– কুমার ধর্মসেনা, মারাইস ইরাসমাস, ক্রিস গ্যাফানি, মাইকেল গুহ, আদ্রিয়ান হোল্ডস্টোক, রিচার্ড ইলিংওর্থ, রিচার্ড কেটেলবোরো, নিতিন মেনন, আহসান রাজা, পল রাইফেল, রড টাকার, অ্যালেক্স হোয়ার্ফ, জোয়েল উইলসন, ক্রিস ব্রাউন ও পল ইউলসন। পুরো বিশ্বকাপের দায়িত্বপ্রাপ্ত ম্যাচ রেফারি হলেন– জেফ ক্রো, অ্যান্ডি পাইক্রফট, রিচি রিচার্ডসন ও জাভাগাল শ্রীনাথ। ❐

প্রতিবেদন :
মো. কবির হোসেন

বিশ্বের সবচেয়ে লম্বা গাছ

গাছপালা কারণেই আমরা এই গ্রহে বেঁচে আছি। গাছ জীবনদাতা অক্সিজেন ত্যাগ করে যা ছাড়া মানুষ বা অন্যান্য প্রজাতির পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।অক্সিজেন দেওয়ার পাশাপাশি গাছ পরিবেশ থেকে বিভিন্ন ক্ষতিকারক গ্যাস শোষণ করে যার ফলে গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর প্রভাব হ্রাস পায়।

বিশ্বে কোটি কোটি গাছে আছে। এদের মধ্যে এমন একটি গাছও আছে, যা বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু গাছ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এই গাছটির ঠিকানা উত্তর আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায়। উচ্চতা প্রায় ১১৫.৮৫ মিটার। এর সামনে কুতুব মিনার এবং স্ট্যাচু অফ লিবার্টি যেন গালিভার-লিলিপুট। সম্প্রতি গাছটি আলোচনায় এসেছে বিশেষ কিছু কারণে, যার মধ্যে অন্যতম বিষয় হচ্ছে হাইপেরিয়নের দিকে নজর দিলেই জেল-জরিমানার জালে জড়াতে হতে পারে যে কাউকে। আর এমনই আইন আরোপ করেছেন মার্কিন সরকার। কিন্তু কেন? তবে, সেই গল্পই শোনা যাক!

গাছটির নাম হাইপেরিয়ন এবং এটি প্রথমে নজরে আসে ২০০৬

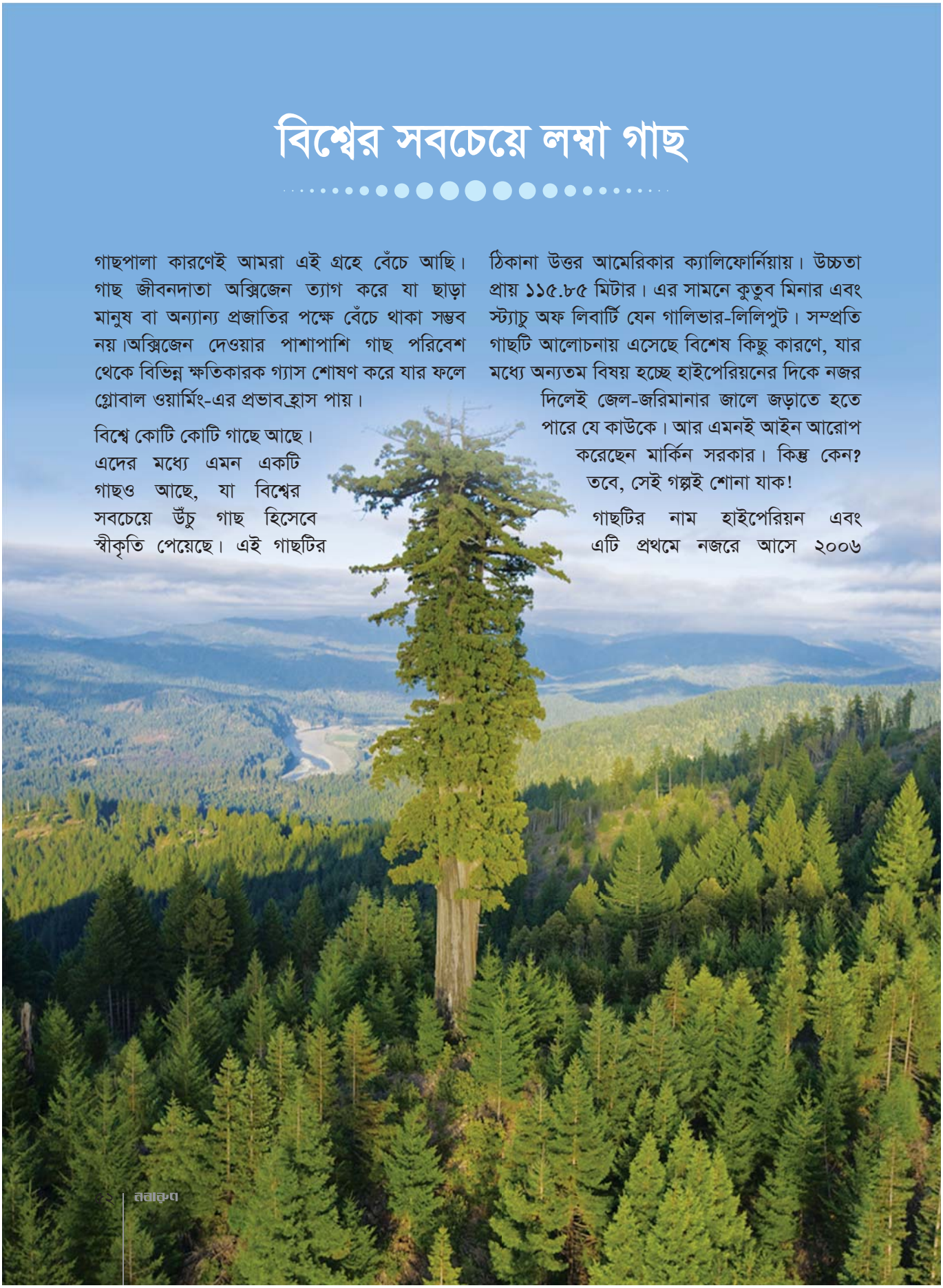

সালে। উচ্চতার কারণে, এটি বিশ্ব রেকর্ড করেছে। ক্যালিফোর্নিয়ার ন্যাশনাল পার্কে এই গাছটির দেখা মিলবে। 'কোস্ট রেডউড' জাতের গাছ 'হাইপেরিয়ন'। গাছের কোস্ট রেডউড নামটি নেওয়া হয়েছে গ্রিক পুরাণ থেকে। আর এই নামকরণটি হয়েছে মূলত পৌরাণিক গ্রিক চন্দ্রদেবী সেলেনের বাবা হাইপেরিয়নের নামানুসারে। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৯ সালে গাছটির ওজন ছিলও আনুমানিক ২০৯ মেট্রিক টন! গাছটির বয়স আনুমানিক ৬০০ থেকে ৮০০ বছর। কিন্তু এখন থেকে কেউ গাছটিকে দেখতে চাইলে তাকে ৫ হাজার মার্কিন ডলার জরিমানা এবং সেইসাথে ছয় মাস কারাভোগের ঝুঁকি নিতে হবে।

এই গাছের মূল অত্যন্ত গভীর এবং এর কোনো শাখা-প্রশাখা পর্যন্ত নেই। এ গাছ বছরে প্রায় ২০ টন কার্বন ডাই অক্সাইড এবং ২০ কেজি ধূলিকণা শোষণ করে। গাছটি সারা বছর প্রায় ৭০০ কেজি অক্সিজেন উৎপাদন করে। গ্রীষ্মকালে গাছের নীচে দাঁড়ালে তাপমাত্রা ৪ থেকে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম লাগে। উপরন্ত প্রতি বছর প্রায় এক লক্ষ বর্গমিটার দূষিত বাতাস ফিল্টার করতে সাহায্য করে এই গাছ।

বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু গাছ 'হাইপেরিয়ন' কাছে যাওয়ার জন্য ভালো কোনো রাস্তা নেই। তারপরও বছরের পর বছর দর্শনার্থীরা গাছটি দেখার জন্য নিজেদের মতো রাস্তা বানিয়ে নিয়েছে। ফলে পার্কের অন্যান্য জন্তু ও গাছপালার স্বাভাবিক আবাসও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ওসব রাস্তায় পার্ককর্মীরা আবর্জনা ও মানব-বর্জ্যও খুঁজে পেয়েছেন। তাই পার্ক কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে লিখেছে, 'একজন দর্শনার্থী হিসেবে আপনি কি এই অনন্য প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণের অংশীদার হবেন নাকি ধ্বংসের সঙ্গী হবেন, সেটা নিজেই ঠিক করুন।'

স্ট্যাচু অব লিবার্টির চেয়ে ১.২৫ গুণ বেশি উঁচু এ গাছটি। এছাড়াও বিশ্বের অনেকগুলো সুউচ্চ গাছ রয়েছে এ পার্কটিতে। আর এখানে থাকা হেলিওস ও ইকারুস নামক দুইটি গাছের উচ্চতা যথাক্রমে ৩৭৭ ফুট ও ৩৭১ ফুট।

দীর্ঘসময় ধরে বেঁচে থাকতে পারে 'রেডউড গাছ'। ক্যালিফোর্নিয়ার 'রেডউড ন্যাশনাল পার্ক' কর্তৃপক্ষ দর্শনার্থীদের অনুরোধ জানিয়েছে গাছটির চারপাশ থেকে দূরে থাকতে। কেননা গাছটির জনপ্রিয়তার কারণে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে ওই এলাকা। এছাড়াও ওই এলাকায় মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক না থাকায় ঘুরতে গিয়ে কেউ হারিয়ে গেলেও অযথা বিড়ম্বনা হতে পারে বলে সতর্ক করা হয়েছে। ❐

প্রতিবেদন : শাহানা আফরোজ

ছোটোদের ডায়াবেটিকে খাদ্য তালিকা

শিশু-কিশোরদের যে ডায়াবেটিস হয়, তাকে জুভেনাইল ডায়াবেটিস বলা হয়। এদের শরীরের অগ্নাশয়ে ইনসুলিন তৈরি হয় না বলে ইনসুলিন অপরিহার্য। এরা টাইপ ওয়ান-এর অন্তর্ভুক্ত। এ ধরনের শিশুদের চিকিৎসা-খাদ্য-যত্ন অন্যান্য স্বাভাবিক বাচ্চাদের চেয়ে বেশি যত্ন নিতে হয়। কারণ কোনোভাবেই তাদের বৃদ্ধি ও বিকাশ যাতে ব্যাহত না হয়। আমাদের কাছে যে-সব খাবার স্বাস্থ্যকর, সেসব খাবার বাচ্চারা খেতে চায় না। এজন্য তাদের খাবার আকর্ষণীয় ও স্বাদযুক্ত করে উপস্থাপন করতে হবে। অল্পবয়সি রোগীদের ওজন দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে এবং তাদের কিটোএসিডোসিসের প্রবণতাও থাকে। এ জন্য এদের খাবার প্রতি কেজিতে ২ গ্রাম প্রোটিন রাখা উচিত। এদের খাবারে কোলেস্টেরল ও সম্পৃক্ত চর্বি কমানো প্রয়োজন নেই। শুধু চিনি-গুড়-মধু বাদ দিলেই হবে। তবে খাবারের ব্যাপারে কিছু বিষয় অবশ্য মনে রাখতে হবে-

খাবারের সময়: প্রতিদিন একই সময়ে খাবার দিতে হবে।

সকালের নাশতা: সকালের নাশতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটা সারা দিনের শক্তি জোগাবে। নাশতায় দিতে হবে রুটি, ডিম, দুধ, ওটস, ভেজানো চিড়া, নরম খিচুড়ি ইত্যাদি তাদের পছন্দমতো।

খাবারের পরিমাণ: শিশুদের কখনো বড়োদের সমপরিমাণ খাবার দেওয়া উচিত নয়। কারণ তাদের উদর বড়োদের তুলনায় ছোটো থাকে।

স্ন্যাকস: শিশুরা বাইরের খাবার খুবই পছন্দ করে। কিন্তু বাইরের খাবারে চিনি-লবণ-চর্বি বেশি থাকে বলে তাদের না দেওয়াই ভালো। তাদের দিতে হবে তাজা ফল, দই, স্যান্ডউইচ, লুচি, পনীর, কলা, বাদাম, ছোলা, নুড্‌লস ইত্যাদি।

উপবাস থাকা: শিশুরা যাতে উপবাস না থাকে অথবা দেরিতে না খায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ এতে হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয়ে বিপজ্জনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে।

মিষ্টিযুক্ত খাবার: জন্মদিন, অথবা অন্য কোনো উৎসবে সামান্য মিষ্টিযুক্ত খাবার দেওয়া যাবে। তবে এ সময় ব্যায়াম বা খেলাধুলার পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হবে এবং ইনসুলিনের পরিমাণ ঠিক করে নিতে হবে।

খেলাধুলা: বর্তমান সময়ে শিশুরা কাজকর্ম, খেলাধুলা কোনোটাই করতে চায় না। এতে রক্তে শর্করা যেমন কমানো যায় না, তেমনি ওজন বাড়ার আশঙ্কা থাকে। এদের প্রতিদিন এক ঘণ্টা খেলাধুলা বা ব্যায়াম করতে দিতে হবে।

খাবারে অনীহা: বাচ্চারা সহজেই খাবার বাতিল বা ফেলে দেয়। এই কারণে তাদের খাবার পরিমাণ মতো ও সহজভাবে তৈরি করতে হবে। যাতে নষ্ট করলেও কোনো অসুবিধা না হয়। দেখা যায়, অনেক বেশি দুধ ও জুস খেলেও খাবারে অনীহা আসে।

সুতরাং কম বয়সি ডায়াবেটিক রোগীদের ক্ষেত্রে চিন্তা-ভাবনা করে খাবার দিতে হবে। ❐

প্রতিবেদন : মো.জামাল উদ্দিন

যুক্তিতর্ক আর প্রমাণে চ্যাম্পিয়ন

প্রথমবারের মতো যুক্তিতর্ক আর প্রমাণের এশীয় লড়াইয়ের শিরোপা জিতল বাংলাদেশ। জাপানিজ সোসাইটি অব ইন্টারন্যাশনাল ল আয়োজিত আইনের শিক্ষার্থীদের এ প্রতিযোগিতার নাম 'এশিয়া কাপ ল ইন্টারন্যাশনাল মুট কোর্ট কম্পিটিশন'।

২০২৩ সালের শিরোপা বিজয়ী বাংলাদেশ দলের সদস্যরা হলেন ঐশী রহমান, রাফিদ আজাদ সৌমিক, ফিয়াজ রব্বানী ও তানহা তানজিয়া। এর মধ্যে ঐশী রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের এলএলএম শিক্ষার্থী। বাকিরা একই প্রতিষ্ঠানে এলএলবি চতুর্থ বর্ষে পড়ছেন। এর আগে বাংলাদেশ কোনো আন্তর্জাতিক মুট কোর্ট প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি।

মুট কোর্ট কম্পিটিশন প্রতিযোগিতায় একটি কাল্পনিক মামলা ধরে দুই পক্ষের মধ্যে যুক্তিতর্ক হয়। সেই কাল্পনিক মামলার বিষয়বস্তু হয় বিশ্বের চলমান কোনো সংকট। বাস্তবের আদালতে একজন আইনজীবী যে-কোনো এক পক্ষের হয়ে মামলা লড়েন। আর মুট কোর্টে দলগুলোকে আইন বিষয়ে দক্ষতা প্রমাণে একেক রাউন্ডে বাদী ও বিবাদী উভয় পক্ষের হয়ে মামলা লড়তে হয়। এ কারণে মুট কোর্টে প্রথম ধাপে অ্যাপ্লিকেন্ট এবং রেসপনডেন্ট নামে দুটি পক্ষ থাকে।

এশিয়া কাপ ল ইন্টারন্যাশনাল মুট কোর্ট কম্পিটিশন ১৯৯৯ সাল থেকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শুরুতে এর নাম জাপান কাপ ছিল। বাংলাদেশ ছাড়াও এবার ভারত, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, কম্বোডিয়া, মালয়েশিয়া, জাপান, ভিয়েতনাম, ইরান, মঙ্গোলিয়া, নেপাল, থাইল্যান্ডসহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের ৫৪টি দল প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিয়েছিল। সেখান থেকে ১৬টি দল নির্বাচিত হয়েছিল।

সেমিফাইনালে ইন্দোনেশিয়াকে হারিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দল। ২৩শে আগস্ট অনুষ্ঠিত ফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ ছিল কম্বোডিয়া। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দলটি বেস্ট অ্যাপ্লিকেন্ট মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড এবং তৃতীয় সেরা রেসপনডেন্ট মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ডও জিতেছে। তৃতীয় সেরা অ্যাপ্লিকেন্ট ওরালিস্ট হয়েছেন রাফিদ আজাদ সৌমিক। ❐

প্রতিবেদন : তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স হিটে প্রথম

বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সে চমক দেখিয়েছেন বাংলাদেশের দ্রুততম মানব ইমরানুর রহমান। ১৯শে আগস্ট হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্টে ১০০ মিটার স্প্রিন্টে প্রাথমিক রাউন্ডের দৌড়ে প্রথম হন তিনি। এক্ষেত্রে তার সময় লেগেছে ১০ দশমিক ৫০ সেকেন্ড। ১০০ মিটার স্প্রিন্টে হিটে তিন নম্বর লেনে দৌড়ান তিনি। তার সঙ্গে দৌড়ানো অন্য সাত প্রতিযোগী তেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতাই করতে পারেননি। এ সময় ধারাভাষ্যকার ইমরানুরকে বলেন, 'ক্লিয়ার কাট ফার্স্ট।'

প্রতিযোগিতার প্রাথমিক পর্বটি মূলত বাছাইপর্ব রাউন্ড হিসেবে গণনা করা হয়। শীর্ষ অ্যাথলেটরা সরাসরি মূল পর্বে খেলেন। বাছাই রাউন্ডে কয়েকটি হিট হয়। সেই সকল হিটের শীর্ষস্থান অধিকারীরা মূল পর্বে জায়গা করে নেন। ইমরান প্রাথমিক পর্বে নিজের হিটে প্রথম হওয়ায় রাউন্ড এক উত্তীর্ণ হয়েছেন।

বুদাপেস্ট থেকে ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আবদুর রকিব জানান, 'আমাদের ইমরান হিটে প্রথম হয়েছে। বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সে কোনো হিটে বাংলাদেশের ক্রীড়াবিদের এমন অর্জন নেই। এটা আমাদের জন্য এক ইতিহাস।'

২০২২ সালেও আমেরিকায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপেও ইমরান একটি ধাপ উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এবারও সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখলেন। অরিগনে অনুষ্ঠিত সেই বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে অবশ্য তিনি পরবর্তী রাউন্ডে দৌড়াননি। বাংলাদেশের দ্রুততম মানব ২০২৩ সালের শুরুতে কাজাখস্তানে ৬০ মিটার এশিয়ান ইনডোরে বাংলাদেশকে স্বর্ণপদক এনে দিয়েছিলেন। ❐

প্রতিবেদন : মেজবাউল হক

আন্তর্জাতিক হকিতে চমক

ওমানে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ বাছাই এশিয়া হকি ফাইভ এ সাইড টুর্নামেন্টে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে সবার নজর কেড়েছেন বাংলাদেশের দুই কিশোরী। অর্পিতা পাল টুর্নামেন্টে ২০ গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতার খেতাব পান, আরেক মেয়ে আইরিন আক্তার টুর্নামেন্টে টানা তিন ম্যাচে হ্যাটট্রিক ও ম্যাচ সেরার পুরস্কার নিজের করে নেন। তিনি টুর্নামেন্টে গোল করেন ১৬টি। ২৫ শে আগস্ট থেকে ২৮শে আগস্ট পর্যন্ত ওমানের সালালাহ শহরে অনুষ্ঠিত হয় এ টুর্নামেন্ট।

ফাইভ এ সাইড হকি বাংলাদেশের মেয়েরা এর আগে কখনো খেলেনি। প্রথমবার খেলতে গিয়ে বেশ ভালোই

করেছে তারা। টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ তিন গোলদাতার দুজনই বাংলাদেশের। এটা বাংলাদেশের জন্য অনেক বড়ো পাওয়া।

বিকেএসপির দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী অর্পিতার বাড়ি দিনাজপুরে। দিনাজপুর বিকেএসপিতে ট্রায়াল দেওয়ার সময় কোচ অর্পিতাকে ছেলেদের সঙ্গে হকি ম্যাচ খেলিয়েছেন। ছোটো মেয়েটির খেলার নৈপুণ্য দেখে কোচ তাকে হকি ক্যাম্পে পাঠান। ২০২০ সালে বিকেএসপির হকির প্রথম ব্যাচে ভর্তি হন তিনি। বোর্ড দিয়ে ঘেরা ছোটো টার্ফে খেলাটা প্রথম দিকে কঠিন মনে হলেও এখন বেশ স্বাচ্ছন্দ্যেই খেলেন অর্পিতা। ফাইভ এ সাইড হকির ৬ ম্যাচে ২০ গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার পেয়ে দারুণভাবে নিজেকে চিনিয়েছেন এই তরুণী।

ঝিনাইদহের পবহাটীর মেয়ে আইরিন আক্তার বিকেএসপির নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী। আইরিন বিকেএসপিতে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন ২০২১ সালে। ওমানে খেলতে যাওয়ার মাস চারেক আগে বিকেএসপি ছেড়ে বাড়ি চলে গিয়েছিলেন তিনি। তার মধ্যে অনেক সম্ভাবনা ছিল বলেই কোচ জাহিদ হোসেন অনেক চেষ্টা করে তাকে ফিরিয়ে আনেন। কাউন্সেলিং করে তাকে টুর্নামেন্টের জন্য তৈরি করেন।

হকি ফাইভ এ সাইড টুর্নামেন্টে প্রথম দিন চায়নিজ তাইপের বিপক্ষে বাংলাদেশের ১০-৫ গোলের জয়ে ৫ গোল করে আইরিন হয় ম্যাচ সেরা। পরের দিন ইরানের বিপক্ষে বাংলাদেশের ৯-৩ ব্যবধানের জয়ে ৪ গোল করে আবারও ম্যাচ সেরা আইরিন। একই দিন স্বাগতিক ওমানের বিপক্ষে বাংলাদেশের ৯-২ গোলের জয়ে আইরিনের গোল ৫ অর্থাৎ টানা তৃতীয় ম্যাচে সেরা। শুধু তাই নয়, সব মিলিয়ে ৬ ম্যাচে তার গোল সংখ্যা ১৬টি।

উল্লেখ্য, বিশ্বকাপ বাছাই ফাইভ এ সাইড এশিয়া হকিতে ৬ ম্যাচ খেলে তিনটিতে জয় ও তিনটিতে হার হয় বাংলাদেশের। দশ দলে অষ্টম হয়েছে বাংলাদেশ। ❐

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

ভাসমান স্কুল

পানির ওপরে বিদ্যালয়! চারদিকে পানি থই থই। আজ তোমাদের জানাবো এমন ভাসমান বিদ্যালয়ের কথা। লঞ্চের ভেতরে গেলেই চোখে পড়বে সুসজ্জিত বেঞ্চে বসা শিশুদের লেখাপড়ার দৃশ্য। হাওরে ভেসে থাকা এই জলযানের ভেতরে চলছে কোমলমতি শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ। বলছি কিশোরগঞ্জের হাওর অঞ্চলে শিশুদের মাঝে শিক্ষার আলো ছড়ানো এক ভাসমান স্কুলের কথা। কিশোরগঞ্জের নিকলী উপজেলার ভাঙন কবলিত ছাতিরচর ও শিংপুর ইউনিয়নে স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় নৌকা এবং লঞ্চে চলছে সাতটি ভাসমান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কার্যক্রম। যা পরিচালনা করছে একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা 'পপি'। হাওরে শিক্ষার আলো বঞ্চিত ও ঝরেপড়া রোধে বিশেষ ভূমিকা রাখছে ভাসমান স্কুল। ঘোড়াউত্রা

নদীর তীরে ভাসমান এসব বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখছে সাড়ে ৩০০ জন শিক্ষার্থী। এ বিদ্যালয় থেকে বিনামূল্যে দেওয়া হয় বই, খাতা, কলমসহ বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ। প্রতিটি ভাসমান স্কুলে শিশু শ্রেণি থেকে ৫০ জন করে শিক্ষার্থীকে পড়ান দুইজন শিক্ষক। প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত চলে স্কুল। শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের জন্য লঞ্চের ভেতরেই রয়েছে বিশুদ্ধ পানি, স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ও বিনামূল্যে প্রাথমিক চিকিৎসাসেবা ও ওষুধের ব্যবস্থা। প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা শেষে শিশুদের নিকটতম উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। ২০২২ সালে শুরু হওয়া ভাসমান বিদ্যালয়গুলো থেকে এ পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেছে প্রায় ১২ হাজার শিক্ষার্থী।

৩৯ বছর ধরে বঙ্গবন্ধুর ছবি আঁকেন

নাম তার রফিকুল। লম্বা দাঁড়ি আর পরনে সাদামাটা পোশাক। প্রথম দেখায় মনে হবে না তিনি ছবি আঁকেন। বর্তমান বয়স ৬৩ বছর। প্রায় ৩৯ বছর ধরে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলো ছড়াতে রং- তুলি হাতে ছুটছেন স্কুল, কলেজ আর পাড়া-মহল্লায়। তিনি দেওয়ালে দেওয়ালে ছবি এঁকে যাচ্ছেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান- এর। তার আঁকা ছবি দেয়াল অঙ্কনের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরছেন স্বাধীনতার মহান স্থপতিসহ জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতিচ্ছবি। তার অঙ্কন তালিকায় আছে- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বাংলাদেশের মানচিত্র, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, সাতজন বীরশ্রেষ্ঠ, বেগম রোকেয়াসহ আরো নানান ছবি। তবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি তার ধ্যানে-জ্ঞানে, মন-মগজে রপ্ত। দেশের বিভিন্ন জেলা, উপজেলায় তিনি বঙ্গবন্ধুর ছবি এঁকেছেন। বঙ্গবন্ধুর প্রতি রফিকুলের ভালোবাসা সৃষ্টি হয়েছিল ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ। এ পর্যন্ত দেড় হাজার ছবি এঁকেছেন। ছবি আঁকার পাশাপাশি তিনি নিজ উদ্যোগে স্কুল, কলেজ, মসজিদ-মাদ্রাসাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অন্তত ৫৫০টি কৃষ্ণচূড়া গাছের চারা রোপণ করেছেন। এক সময় পেশায় রিক্সাচালক থাকলেও বর্তমানে তিনি ছবির ফেরিওয়ালা। পাশাপাশি তিনি একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীও। বঙ্গবন্ধুভক্ত রফিকুলের বাড়ি রংপুর মহানগরের তাজহাট বাবুপাড়া এলাকায়।

১৪ বছরেই প্রযুক্তিবিদ

এখন যদি প্রশ্ন করা হয় বিশ্বের শীর্ষ ধনী ইলন মাস্কের সংস্থা স্পেস এক্সে সবচেয়ে সর্বকনিষ্ঠ প্রযুক্তিবিদ কে? উত্তর হবে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী কাইরান কাজী। সর্বকনিষ্ঠ এই প্রযুক্তিবিদ মার্কিন বিলিয়নিয়ার ইলন মাস্কের মহাকাশবিষয়ক প্রতিষ্ঠান স্পেস এক্সে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে যোগ দিয়েছেন। এই কোম্পানিতে মজার কিন্তু জটিল ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া তিনি পার করেছেন অত্যন্ত সহজেই। খুব দ্রুত কোম্পানিটির হয়ে কাজ শুরু করবেন বাংলাদেশি এই কিশোর। বর্তমানে কাইরানের বয়স মাত্র ১৪ বছর! ১১ বছর বয়সে যুক্তরাষ্ট্রের সান্টা ক্লারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার সায়েন্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া শুরু করেছিলেন তিনি। ২০২৩ সালে গ্র্যাজুয়েট হয়ে চাকরি নেন কাইরান। বিষয়টি নিয়ে বেশ উচ্ছ্বসিত কাইরান কাজী। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তিনি লিখেছেন, 'বিশ্বের এক দারুণ সংস্থায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে যোগ দিতে চলেছি আমি। যে সংস্থা আমার বয়সকে একেবারেই প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দেখেনি...'। বইপড়ার ক্ষেত্রে কল্পবিজ্ঞানের পোকা সে। তার প্রিয় লেখক ফিলিপ কে ডিক। সাংবাদিকদের মধ্যে প্রিয় অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ মাইকেল লুইস।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

বুদ্ধিতে ধার দাও

নাদিম মজিদ

শব্দধাঁধা

পাশাপাশি: পাশাপাশি: ৩. জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ কোথায় সাক্ষরিত হয়, ৫. মূল্য, ৬. বৎসর, ৮. যে স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে কাজ করে, ১০. খনি, ১২. নিষ্পত্তি, ১৩. একটি মাছ

উপর-নিচ: ১. একটি অঙ্ক, ২. বিশ্ব শিশু দিবস কোন মাসে পালন করা হয়, ৩. ওষুধি গাছ, ৪. শিশুদের নিয়ে কাজ করা জাতিসংঘের একটি প্রতিষ্ঠান, ৭. যে জীব থেকে মাশরুম উৎপন্ন হয়, ৯. গগন, ১১. রান্নায় মসলা হিসেবে ব্যবহৃত একটি সবজি

■	■	■	■	১	*	■	২
■	৩		৪			■	
৫		■		■	■	■	
■	■	■		■	৬	৭	
■	৮				■		■
৯	■	■		■	১০		১১
১২			■	■	■	■	
	■	■	■	১৩			

ছক মিলাও

শব্দ ধাঁধার মতোই এক ধরনের ধাঁধা ছক মিলাও। ছকে যে সব শব্দ বসিয়ে মেলাতে হবে, তা নিচে সংকেতের পাশে দেয়া হলো। বোঝার সুবিধার্থে একটি ঘর পূরণ করে দেয়া হল।

সংকেত: বিশ্ব শিশু দিবস, মা, অবিচল, সেচ, ললিতকলা, তখত, শুশুক, কাপড়, অবশ, চাপরাশি

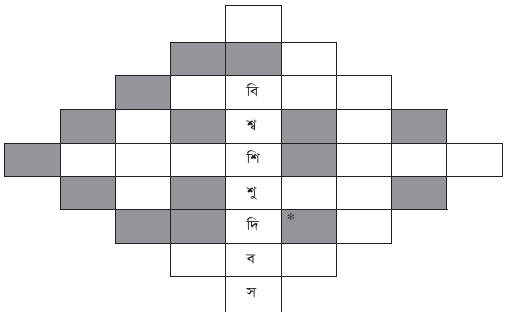

নাম্ব্রিক্স

নিচের ছকটির নাম নাম্ব্রিক্স। ১-৮১ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো থেকে ছকটিতে প্রতিটি সংখ্যা একবার করে বসাতে হবে। সংখ্যাগুলোকে ক্রমিকভাবে বসাতে হবে। বসানোর সময় পরের সংখ্যা পাশাপাশি বা উপরে-নিচে আকারে বসবে, কোনাকুনি বসানো যাবে না।

৭৩		৭৫		৩৯		৩৩		২৭
	৮১		৪১		৩৫		২৯	
					৩৬	৩১		২৫
৭০	৭৯	৭৮		৪৪			২৩	
	৬৬		৬৪		২০	১		৩
৬৮	৬৭		৬৩	৪৬		১২	১১	
৫৭		৬১	৪৮					
	৫৯	৬০	৪৯		১৭		৯	
৫৫				৫১		১৫		৭

ব্রেইন ইকুয়েশন

সরল অঙ্কের মৌলিক নিয়মকে মেনে তৈরি করা হয়েছে ব্রেইন ইকুয়েশন। ছকটির খালি ঘরগুলো মেলানোর সময় অবশ্যই পাশাপাশি এবং উপর-নিচের অন্যান্য সমীকরণগুলোও মেলাতে হবে।

৩	*		-	৬	=	
+	■	*	■	-	■	+
	+	১	-		=	০
-	■	-	■	*	■	+
১	*		+	১	=	
=	■	=	■	=	■	=
	+	২	-			৯

জুন মাসের সমাধান

শব্দধাঁধা

মা	চু	পি	চু		ভা	র	ত
দা			না				র
গা	ড়ি		পা	না	মা	খা	ল
স্কা		প	থ		ন		
র	ণ		র		সা	ক্ষ	র
		ফা		কা	ঙ্ক		ত্ন
		ল্লু		গ			গ
	ব	ন	ভো	জ	ন		র্ভা

ছক মিলাও

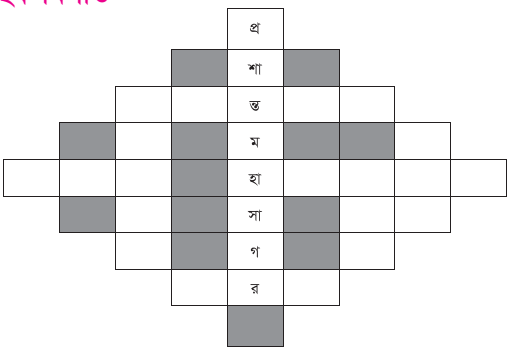

ব্রেইন ইকুয়েশন

৮	-	৫	+	১	=	৪
+		-		*		*
৩	*	২	-	৫	=	১
-		*		-		-
৭	*	১	-	৪	=	৩
=		=		=		=
৪	-	৩	*	১	=	১

নাম্ব্রিক্স

৫৭	৫৬	৫৫	৫৪	৫৩	৫২	৩৯	৩৮	৩৭
৫৮	৭৩	৭২	৭১	৫০	৫১	৪০	৪১	৩৬
৫৯	৭৪	৭৫	৭০	৪৯	৪৬	৪৫	৪২	৩৫
৬০	৮১	৭৬	৬৯	৪৮	৪৭	৪৪	৪৩	৩৪
৬১	৮০	৭৭	৬৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩
৬২	৭৯	৭৮	৬৭	২৮	১৩	১২	১১	১০
৬৩	৬৪	৬৫	৬৬	২৭	১৪	১	৮	৯
২২	২৩	২৪	২৫	২৬	১৫	২	৭	৬
২১	২০	১৯	১৮	১৭	১৬	৩	৪	৫

m¤§vbx MÖnYi weÁwß

‘মাসিক নবারুণ’ পত্রিকায় ২০০৮-২০০৯ অর্থবছর থেকে ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে প্রকাশিত লেখার যে-সকল সম্মানিত লেখক সম্মানী গ্রহণ করেননি তাদের নামের তালিকা চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে www.dfp.gov.bd এবং নবারুণ ফেইসবুক পেজ Nobarun Potrika-এ প্রকাশ করা হয়েছে। যে-সকল সম্মানিত লেখক উল্লিখিত সময়ে লেখার সম্মানী গ্রহণ করেননি ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখের মধ্যে ডিএফপিতে যোগাযোগ করে তাঁদের সম্মানী গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো। উল্লেখিত তারিখের মধ্যে সম্মানী গ্রহণ না করলে উক্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হবে।

সম্পাদক, নবারুণ
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড
ঢাকা-১০০০

সামিহা হোসেন উম্মি (উষা), দ্বিতীয় শ্রেণি, মডেল একাডেমী, মিরপুর-১

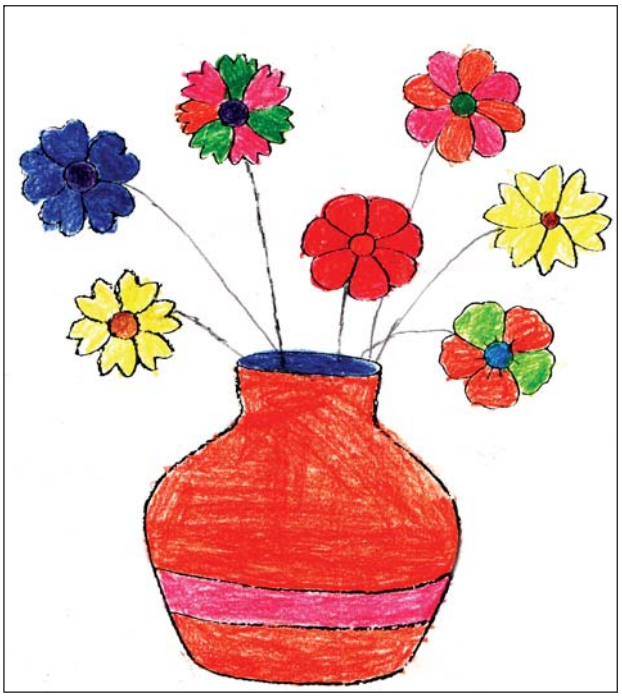

ইরিনা হক, অষ্টম শ্রেণি, সানি ডেইল স্কুল, ঢাকা

ইমি রহমান, চতুর্থ শ্রেণি, টাঙ্গাইল উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল

রিদওয়ান হোসেন হানিফ, পঞ্চম শ্রেণি, কোয়ালিটি এডুকেশন স্কুল, খিলগাঁও, ঢাকা

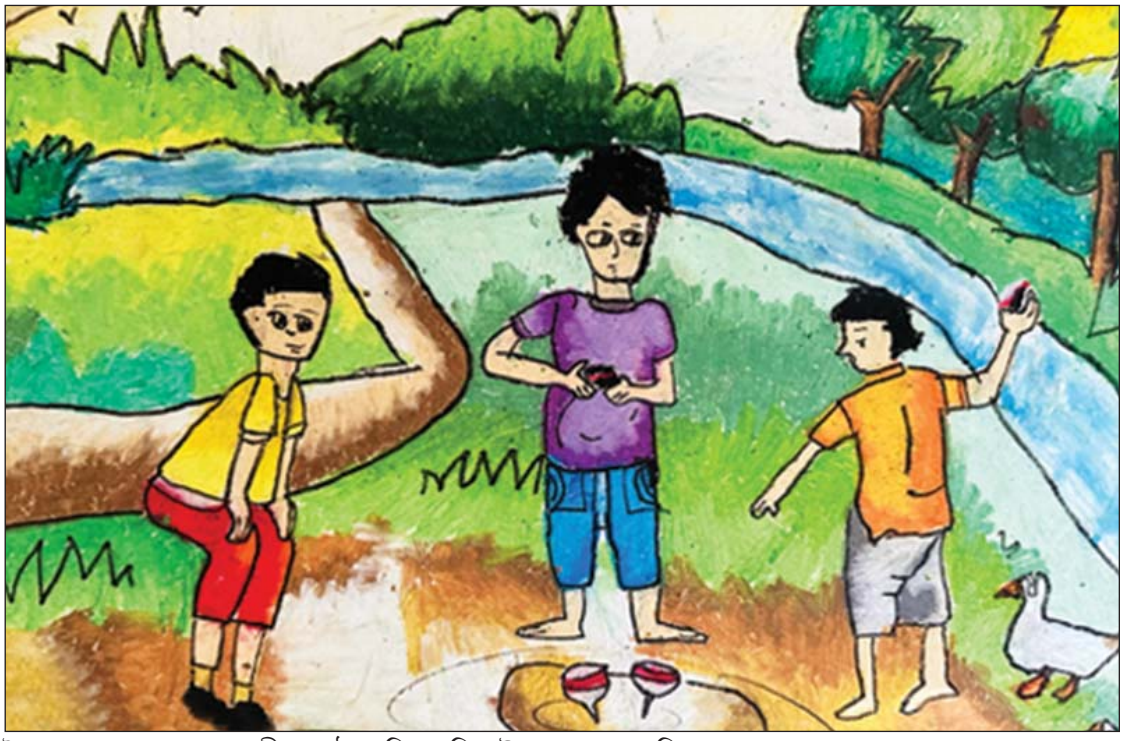

সৈয়দ ফারসাদ নেয়ামুল সীন, ষষ্ঠ শ্রেণি, সানিডেইল স্কুল, ধানমন্ডি

সাইয়ান খান, সপ্তম শ্রেণি, আল ফুরকান স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মহানগর প্রজেক্ট, রামপুরা, ঢাকা

ডেঙ্গু প্রতিরোধে

সচেতনতা

- ❑ জমে থাকা পানি নিয়মিত অপসারণ করতে হবে
- ❑ চারপাশের জায়গা পরিষ্কার পরিছন্ন রাখতে হবে
- ❑ পানি জমে থাকতে পারে এমন জিনিসপত্র উলটে রাখতে হবে
- ❑ ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি ব্যবহার করতে হবে
- ❑ জানালাতে মশা প্রতিরোধক নেট ব্যবহার করতে হবে
- ❑ শরীরের অনাবৃত স্থানে মশা নিবারক ক্রিম ব্যবহার করা যেতে পারে
- ❑ মশা নিধনের ওষুধ, স্প্রে কিংবা কয়েল ব্যবহার করা যেতে পারে
- ❑ পাতলা কিংবা ঢোলা পোশাক পরিধান থেকে বিরত থাকবেন
- ❑ শিশু এবং বয়স্কদের বিশেষ যত্ন নিয়ে নিরাপদে রাখবেন

Regd. Dha. 143, Monthly Nobarun, Vol-48, No-03. September 2023, Tk-20.00

Memorandum No: 15.00.0000.019.05.003.16-211/2022

ইউসুফ হায়দার আদিব, দ্বাদশ শ্রেণি, উইল্‌স লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ, কাকরাইল

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

তথ্য ভবন

১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা